মনন

তারুণ্যের প্রকাশনা

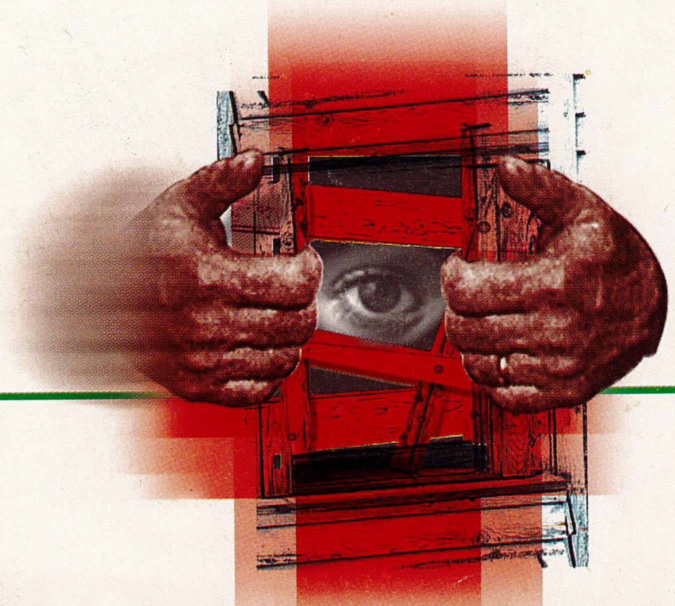

সম্পাদকীয়

এই থেকে
আমাদের
যাত্রা শুরু।
যথাসম্ভব
খুব দ্রততম
সময়ে
'মনন' এর
পরবর্তী সংখ্যা
বেরুবে।
তারুণ্যের স্পর্শ
যাদের কলমে
আছে- শুধু
তাদের জন্যই
লেখার আমন্ত্রণ
অবারিত। আপনার সাথে
ডাকযোগের ঠিকানাটা থাকলে
আমাদের পক্ষে যোগাযোগ
করাটাও সহজ হবে॥

মনন

তা রু ণ্যে র প্র কা শ না

প্রথম প্রকাশ

বইমেলা প্রকাশনা '৯৮

সম্পাদক মণ্ডলী
সানী আশ্রাফ
শৈলী নিসার
শাহরিয়ার খান

প্রচ্ছদ নকশা ঃ আজহার
অলংকরণ ঃ হামিদুল হক মানিক

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
ময়নুল হাসান মুকুল,
শিপা কম্পিউটার, নীলক্ষেত
ফোন ঃ ৯১২৮০৪৫

মুদ্রণ : টেকনোসফ্‌ট, ৪৯ আরামবাগ (২য় তলা), ঢাকা।

১৪/১, লেক সার্কাস কলা বাগান, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৮২১৬ ০৩২, ফ্যাক্স ঃ ৮১৬৭৮৩ থেকে প্রকাশিত।

সূচিপত্র

প্রতিবেদন
তারুণ্যের একুশে চেতনা ঃ মনন প্রতিবেদন
প্রবন্ধ
অমর একুশে ঃ আব্দুল লতিফ জামী
গানও'লা সুমন, সুমনের গান ঃ ফারজানা রূপা
বাংলার লোকচিত্রের স্বরূপ ঃ ম হা মানিক
বইমেলা-তারুণ্যের উৎসব ঃ শৈলী নিসার
ইন্টারনেটের সাতকাহন
যুদ্ধ এসে থেমে গেছে বন্ধুত্বে ঃ আশ্রাফ আবির
ন্যাটো ঃ নয়া বিশ্বে নয়া রূপে ঃ সাইফুর রহমান তারিক
সাক্ষাৎকার
পার্থ প্রতিম মজুমদার ঃ পদ্মাপাড়ের চোখে পৃথিবী দেখেন যিনি ঃ আশ্রাফ আবির
হুমায়ূন আহমেদ - এক টুকরো সাক্ষাৎকার ঃ মনন প্রতিনিধি
পার্থ বড়ুয়া - নিজের কথা গানের কথা ঃ মনন প্রতিনিধি
কবিতা
স্খলনের পরে ঃ শামসুর রাহমান
ভ্রমণ নির্দেশিকা ঃ আবু হাসান শাহরিয়ার
ভবঘুরে দিন ঃ সমুদ্র গুপ্ত
ঐতিহাসিক বর্তমান ঃ উজ্জয়িনী
সুচিপত্র ঃ মীর মাসরুর জামান
সে পথ দিয়েই হাঁটি ঃ মুকুল শাহরিয়ার
বন্ধুকে ঃ আনিসুর রানা
ছড়া
দু'টি ছড়া ঃ লুৎফর রহমান রিটন
দলাদলি ঃ ওবায়দুল গণি চন্দন
ও খোকা তুই ঃ সারোয়ার-উল-ইসলাম
বয়স যখন আঠারো ঃ তুহিন রহমান
একুশ উঠবে বেজে ঃ উৎপল দত্ত
গল্প
রূপকথার মতো ঃ আনোয়ারা বেগম
অবান্তর ঃ শাহরিয়ার খান
হাসি ঃ মূল রে ব্রাডবেরী, অনুবাদ ঃ হাসান খুরশীদ রুমী
কয়েকজন রোবট ঃ অনিরুদ্ধ আলম
নেতা যে রাতে নিহত হলেন ঃ ইমদাদুল হক মিলন

তারুণ্যের একুশে চেতনা

এ প্রজন্মের তারুণ্য - আধুনিক সভ্যতার দাবীদার, যাদের অধিকাংশের সময় কাটে কম্পিউটা, ইন্টারনেট আর স্যাটেলাইট নিয়ে। এদের আড্ডার বিষয় ক্রিকেট, মঙ্গল গ্রহ, সায়েন্স ফিকশন বা হলিউড গসিপ। কিন্তু, এ প্রজন্মের তারুণ্য কতটুকু জানেন এদেশের মাতৃভাষা অর্জনের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে, ভাষা আন্দোলনের বীর

শহীদদের রক্ত ত্যাগ তাদের কতটা আপ্লুত করে, কিইবা তারা ভাবে জাতির কাছে দায়বদ্ধতার কথা - তা জানতেই তারুণ্যের প্রকাশনা মননের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের উপর সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক একটি জরিপ। প্রথমত জরিপের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের। স্পট ঠিক ছিল-তারুণ্যের সমাহার একুশের বইমেলা প্রাঙ্গন। কিন্তু, একী ! শতকরা দশভাগ ছেলেমেয়েও সঠিক উত্তর দিতে পারছেনা। এক্ষেত্রে, মতিঝিল মডেল হাই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র আমানুল ইসলামের অঙ্গীকারটি ছিল ভাবার মতো- একুশের মূল কাহিনী ছোটদের নিরপেক্ষভাবে জানানো। তবে কোন কোন ইঁচড়ে পাকা ছেলে যখন মন্তব্য করেছে রাসপুটিনের কবিতার বই সর্বত্র চালু করা উচিৎ - তখন ব্যাপারটি ছিল কষ্টদায়ক।

যাহোক, স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের কাছ থেকে সঠিক উত্তর না পেয়ে টার্গেট গ্রুপের বয়স কলেজ পর্যন্ত বাড়ানো হলো। কিন্তু, এদের আজ্ঞতার সাথে শামিল হয়েছে অসততা। অনেকেই, সাথে আসা

ভাই, বন্ধু বাবার কাছ থেকে জেনে জেনে বহুকষ্টে উত্তর লিখলেন। কিন্তু, সঠিক উত্তরের হার খুউব বেশী বাড়লনা। অতঃপর গণজরিপ। তাতে ও বিপত্তি কম নয়। প্রতিষ্ঠিত দৈনিক পত্রিকার একজন সাংবাদিকের হাতে ফর্মটি ধরিয়ে দেয়া হলে হাস্যকরভাবে বললেন, আজ বাসায় নিয়ে যাই, কাল দিয়ে দিব। আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। জরিপকারী পরিচালনাকারী তিনটি গ্রুপের একসময় চোখ পড়ল জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ তনয়া, বিটিভির পরিচিত মুখ শিলা আহমেদের দিকে। হলিক্রস স্কুলের ,দশম শ্রেণীর ছাত্রী শিলা ওর তিন বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে এসেছিল বইমেলায়। দেখা হতেই খুউব আগ্রহভরে সবাই ফর্মটি নিল। প্রশ্ন দেখে মুখভঙ্গি যা করলো, জরিপকারীরা থমকে গিয়ে ভেবেছিল ভুল করে ওদের বুঝি কোন জটিল বিজ্ঞানের প্রশ্ন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।

মননের পক্ষ থেকে পরিচালিত এ জরিপে অংশ নেন স্কুল পড়ুয়া কিশোর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ, সাংবাদিক, ছড়াকার, সংস্কৃতিকর্মী, প্রকাশক, লেখক মোট ১০০ জন। জরিপ ফর্মের প্রথম পশ্নটি ছিল - '৫২ এর ২১শে ফেব্রুয়ারী কি ঘটেছিল - শতকরা একশ জনই এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর লিখতে পারলেও ভাষা আন্দেলনের - কারণ সংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি দিতে পারেননি ১৫% জন। তারুণ্যের প্রকাশনা মননের পক্ষ থেকে পরিচালিত জরিপের তিন নাম্বার প্রশ্নে ২১শে ফেব্রুয়ারী বায়ান্নতে শহীদ হওয়া পাঁচ জন বীরের নাম উল্লেখ করতে বলা হয়েছিল। শতকরা পঞ্চাশজন লিখেছেন ৫ জনের নাম। শতকরা চৌত্রিশ জন লিখেছেন ৪ জনের নাম এবং ৩ শহীদ মিনারের স্থপতি সংক্রান্ত পরের পশ্নটির সঠিক উত্তর দিয়েছেন শতকরা সত্তর জন। অনেকেই উল্লেখ করেছেন নভেরা আহমেদের নাম। কেউ বলেছেন সহকারী নভেরা আহমেদ। শেষ প্রশ্নটি ছিল - এবারের একুশে আপনার ব্যক্তিগত কোনো অঙ্গীকার আছে কি ? থাকলে সেই অঙ্গীকারটি কি? - এক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় হারের উত্তরদাতা লিখেছেন - এবারের একুশে তাদের কোন অঙ্গীকার নেই। সম্মিলিত-সাংস্কৃতিক জোটের সংস্কৃতি-কর্মী টি.এস.সি.'র পরিচিত মুখ-উত্তরদাতাদের ভূমিকা ছিল চরম নৈরাশ্যজনক। তারা খুব গর্বিতভাবে একুশের অঙ্গীকার নেই বলে উল্লেখ করেছেন। ফেব্রুয়ারী এলেই যখন একের পর এক মঞ্চ উত্তপ্ত হতে থাকে, নতুন নতুন বইয়ে সয়লাব হয়ে যায়। বইমেলাসমূহ প্রচার মাধ্যম সমূহে ঘোষিত হতে থাকে আগুনঝরা অঙ্গীকার আর নানা ধরণের মনোহর পরিকল্পনা তেমন একটি সময় ইতিহাস ও চেতনা বিষয়ক এই প্রাথমিক পর্যায়ের জরিপটি আমাদের লজ্জিত করে। স্তম্ভিত করে প্রায়। তাই,একুশে উদযাপনের এই মহা আয়োজনে ভীড়ে একটি ক্ষীণ আহ্বান অন্ততঃ উচ্চারিত হতে পারে এমন, মনে ও মননে, চিন্তায় ও কাজে সত্যিকারের বাঙালি প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্য সূচিতে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস অন্তর্ভূক্ত করা হোক। প্রচার মাধ্যমসমূহে এই বিষয়ে এমন কার্যক্রম প্রচার করা হোক যাতে শুধু কারো কারো আত্মপক্ষ প্রচারই নয় বরং ইতিহাস ও চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ছড়িয়ে যেতে পারে। আর এ জন্যে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব যারা গ্রহণ করেন বা করতে চান এবং নিজেদের আলোচিত মানুষ বলে যারা দাবি করেন তাদের অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব রয়েছে। এইদায় এড়ানোর আসলে কোনো পথ নেই।

মনন প্রতিবেদন

সৈয়দ আব্দুল লতীফ জামী

অমর একুশে

অমর একুশে বলতে আমাদের বাংলাদেশীদের মনে পড়ে প্রায় চারযুগ আগেকার এক রক্তঝরা নিষ্ঠুরতম থেকে নিষ্ঠুরতম পৈশাচিক ঘটনা। কল্প-কথা নয়, দিনের আলোর মত সত্য এক নারকীয় নৃশংসতা। ইংরেজী ১৯৫২ সাল ২১শে ফেব্রুয়ারী। দাবী ছিল বাংলাকে রাষ্টভাষা করা হোক। তখন এ বাংলাদেশের নাম ছিল পূর্বপাকিস্তান, পাকিস্তানের অন্য অংশের নাম ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। জনসংখ্যায় গরিষ্ঠ পূর্ব-পাকিস্তান। মাতৃভাষা বাংলা। শাসক সম্প্রদায় ছিল ওরা, পশ্চিম পাকিস্তানীরা, যদিও ওরা ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। তথাপি তাদের মাতৃভাষা উর্দুকেই চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল আমাদের উপর। কেড়ে নিতে চেয়েছিল আমাদের মহান মাতৃভাষা। চামচার অভাব ছিলনা কোন কালেই। তাই আমাদের এই মাটিতে জন্ম নিয়ে একদল মেতেছিল ওদের সাথে। কিন্তু না, তখনকার এক দল উদ্দাম ছাত্র প্রতিবাদ জানাল এই জঘন্যতম পরিকল্পনার। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পাঞ্জাবী-কোরেশীর আদেশে নিরস্ত্র, নিরীহ প্রতিবাদ মুখর উদ্দাম ছাত্রদের উপর বাঙ্গালী (পূর্ব পাকিস্তানী) পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বার, সালামের রক্তাক্ত লাশ ঢলেপড়ে ঢাকামেডিক্যাল কলেজের সামনে ঐ জায়গায় যেখানে পরবর্তীতে নির্মাণ করা তাদের স্মরণে 'শহীদ মিনার।'

সেদিন যাঁরা এভাবে প্রাণ দিলেন মাতৃভাষা বাংলার জন্যে তাঁরা বেঁচে থাকলে অনেকেই প্রৌঢ়ত্বের সীমানা পেরিয়ে যেতেন। তাঁরা চলে গেলেন ... রেখে গেলেন তাঁদের অমরকীর্তি। কীর্তির চেয়েও মহৎ কিছু।

কিন্তু তাঁদের নাম আজ বিস্মৃত প্রায় - বিস্মৃত তাঁদের অমর কীর্তি ! অনেকেই জানেন শুধু 'শহীদ মিনার' নামটি। এর বেশী কিছু নয় ! বছর ঘুরে ফেব্রুয়ারী মাস এসে জাগিয়ে দেয় দিবসটি পালনের তাগিদ। ২০শে ফেব্রুয়ারী সূর্য ডোবার পর আসে রাত। সে রাতের বারটার পর এই রাজধানী শহরের সবচে উঁচুদরের ব্যক্তিত্বদের এই 'শহীদ মিনারে' পুষ্পমাল্য অর্পনের মাধ্যমে শুরুহয়

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। তারপর থেকে শুরু হয় নানা বয়সের, নানা মেজাজের বহুজনের নগ্নপদে আগমন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানেন না এর প্রকৃত ইতিহাস!

তাঁরা জানেন ঐ দিন বা ঐ রাতে নগ্নপদে এসে ওখানে পুষ্প অর্পন করতে হয়। ব্যাস, তারপরই শেষ হল তাঁদের কর্তব্য (!) কয়েক বছর আগে সে রাতে ওখানে ঘটেছিল এক জঘন্যতম ঘটনা। লিখতে কলম চলেনা। নাইবা লিখলাম। যাঁরা জানেন তাঁরাত জানেন। যারা জানেন না নাইবা জানলেন তাঁরা।

এবার আসি আসল কথায়। অবশ্য আমি নিজে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নই। বয়সে আশি ছুঁই ছুঁই। তবু যা' অনুভব করি সেই বেদনাটাই দু'এক কথায় প্রকাশ করতে বড়ই ইচ্ছে। তাই লিখতে বসেছি।

মনে হয় কোন এক সময় শুনেছিলাম, দাবী ছিল, "সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু হোক।" হয়েছে কি? স্তর গুলিই বা কি তা'ও জানি না। রাজধানী শহর ঢাকাতেই দেখি অনেক দোকানের নাম - সে গুলি বাংলা ভাষা কিনা তা ভাষাবিদরাই ভাল জানেন। বড় বড় আধুনিক ধাঁচের দোকান পাটের সমাহার, তাদের নাম করণ, "নিউমার্কেট।" জানিনা এর বাংলা প্রতিশব্দ আছে কি না - "ইষ্টার্ণ প্লাজা" - এ কোন ধরণের বাংলা! রাস্তার নাম - মীরপুর রোড, আজিমপুর রোড, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ।

রোকেয়া সরণী, পান্থপথ, বিজয় সরণী, দোয়েল চত্বর এ গুলি শুনতে কত ভাল লাগে। কত মিষ্টি লাগে শাপলা চত্বর শুনতে, নয়কি? অমুক স্ট্রীট, তমুক লেন, অমুক রোড -কেন এ গুলির বাংলা প্রতিশব্দ কি নেই? হ্যাঁ, তবে ভাষা সমৃদ্ধ করতে কোন একটা ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার সংমিশ্রণ থাকে বা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মনে হয় সে ভাষায় ঐ শব্দটা না থাকলে অন্য ভাষা থেকে সেটা আহরণ করতে হয়। কেন ২১শে ফেব্রুয়ারী? ইং ১৯৫২, বাংলা "সন", "সাল" ছিল? ঐ দিনটি ফাল্গুনের কত তারিখ ছিল? সেটা চালু হয়নি! হায়রে হুজুগে বাঙ্গালী! এ যেন সোনার পাথুরে বাটী!

যদিও অপ্রাসঙ্গিক তবুও একটা কথা না লিখে পারছিনা। বেশ কিছুকাল ধরে বাংলা কবিতার যা 'উন্নতি দেখছি তা'তে আনন্দ পাবারই কথা। কিন্তু কেন যেন পড়ে কিছুই বুঝতে পারিনা! এর কারণ হতে পারে - ভাষা জ্ঞানের দৈন্যতা অথবা রসজ্ঞানের অভাব। তাই মনে হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ "নোবেল প্রাইজ" না পেয়ে এ যুগে বেঁচে থাকলে তিনি কিছুতেই ঐ পুরস্কারটি পেতেন না।

লেখক ঃ অবসরপ্রাপ্ত উপপুলিশ সুপার

বাংলার ধনুকের ছিলায় ছিলায় যত টান, তীরের ফলায় তবু বিষ নয় লালনের গান। সে গানে বিদ্ধ বুক, রক্তে অশ্রু ছলছল, এ যদি আমার দেশ না হয় তো কার দেশ বল? কেবল বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা পৃথিবী যার আপন দেশ সেই মানুষ সুমন চট্টোপাধ্যায় গান, সুর কথায় মানুষকে আত্মার আত্মীয় করে নেয়ার অদ্ভুত ক্ষমতাবান এ মানুষটির কাছে গেলে মনে হয়, কেউ একজন ভাবছেন পৃথিবী নিয়ে আমাদের নিয়ে মানুষকে নিয়ে। হাউজ দ্যাট "-শুনেই সবচেয়ে ম্রিয়মান ছেলেটির ভেতরেও মাথা চাড়া দেয় তারুণ্য। মনে হয় কি যেন করার আছে, একটা কিছু করি। সেদিন, ৯ই ফেব্রুয়ারী-ইনডোর ষ্টেডিয়াম-মুহুর্মুহু করতালি কখনও গভীর নিরবতা বাঁধভাঙ্গা উল্লাস-মিশ্র অনুভূতিতে মেতে উঠা-এরই নাম যেন সুমানের গান। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের এ সমাজ -এ বিশ্বকে নতুন রুপে গড়ে তোলার অদ্ভুত রুপে গড়ে তোলার অদ্ভুত এক তাড়নায় পূর্ণ এ গান। আমি আপনাদের সুখ চেয়ে আছি, এদেশের তারুণ্যের পক্ষেই সম্ভব এ অসময়ে একটা কিছু করা। বিভক্ত জাতি, দুঃখী মানুষ, মানুষের কষ্ট -বড় বেশী ভোগায় সুমনকে। তাইতো মানবতার এ জয়গান। ওপাড় বাংলার সুমন কখনও ভুলেন না তিনি পৃথিবীর মানুষ, তাই সব স্বীকারোক্তি তার অকপট। অনায়াসে গানে গানে বলেন- এপাড়ের কবি। সাহিত্যকদের প্রতি আড্ডায় সুমন বলেছিলেন, সমাজ আর গানের চরম অমিল তাকে দীর্ঘদিন গান গাইতে দেয়নি। অবশেষে নিজের লেখা প্রথম গান পঁচাত্তর সালে -এ কেমন আকাশ দেখালে তুমি এ কেমন আকাশ জন্মভূমি, এটা শুধু কান্না, শুধুকান্না এ কান্না আমি চাইনা, চাইনা। সেই থেকে শুরু, তার পর অবিরাম পথ চলা, যা লক্ষ্য ঘুমন্ত তারুনদের মাঝে তারুণ্য জাগিয়ে তোলা। তাইতো, গানের মাঝেই কথা বলে উঠা -তার কৃতজ্ঞতার কথা বলেন শহীদ কাদরী বা শামসুর রহমানের কবিতা তাকে বিশেষ গানে অনুপ্রানিত করেছে। বলেন ছোটবেলার সেই বেহালা বিক্রেতার কথা। সুমনের গানে ভেসে উঠে অন্য এক ব্যতিক্রমী মানুষ। যার প্রনাম, সাবলীল কথা, গান নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। স্বপ্ন দেখার নতুন পৃথিবীর। নিয়ে যায় গান ওয়ালার দেশে।

ম হা মা নি ক

বাংলার লোক চিত্রের স্বরূপ

আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি। এর রূপ নিরূপনে লোক শিল্প একটি প্রধান উপকরন। গ্রামীন লোক সমাজের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সংস্কার ও আচরণের প্রয়োজনে লোক শিল্পের সৃষ্টি বিকাশ।

এ ক্ষেত্রে লোক শিল্প কেবল শিল্পই নয় বরং ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি বিচারের মাপকাঠি। এর বিশ্লেষণ ও মুল্যায়ন জাতীয়তার নিরিখে হওয়া যুক্তিসংগত। লোক শিল্পের বিস্তৃতক্ষেত্র ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক পরিবেশ। সমাজ গঠন, ব্যক্তি বা সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা।

যখন কোন বাস্তব প্রতিচ্ছবি রংয়ের সাহায্যে ফুটিয়ে তুলা হয় তখন তা বর্ণাঢ্য চিত্রের বিষয় আর যখন রেখার বিন্যাসে বস্তুর প্রতিভাস সৃষ্টি করা হয় তখন তা নকশার ত্রিবষয়। লোকশিল্পে কেবল চিত্র ও নকশাই আসেনি। সুচিকর্ম, বয়নশিল্প, আদর্শায়ন, ভাস্করণ, ইত্যাদি বিষয়ও এসেছে। বাংলার লোক শিল্পের প্রদান পরিচয় হলো প্রতীক ও মাটিকে। সাধারণত: ভাবকল্পনা ও কামনার বিষয়গুলো প্রত্যেকের সাহায্যে রূপভিব্যিক্তি লাপভ করে। যেমন বাংলার আলাপনা চিত্র। শিল্পকে গোষ্ঠিনির পেক্ষতার পর্যায়ে নিয়ে গেছে এলাকায়ও মাটিকগুলো। মাটিকের সাংঙৈকতিক, প্রতীক, রূপক ও গুর অর্থ থাকতে পারে আবার কোথাও নাও থাকতে পারে। লোক শিল্পের রূপ রীতিতে রং ও রেখার যে স্থুল ব্যবহার আছে ষড়ঙ্গের বিন্যাসে তাতে সমতা রউক্ষিত হয় না। বর্ণের আলো ছাড়ার অভাবে চিত্র বসস্তর অতিরিক্ত ভাবমূর্তি বর্ণের আলো ছায়ার অভাঐেব চিত্র বস্তুর অতিরিক্ত ভাবমূর্তি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ রূপে রং -এ রেখঋায় বাস্তবের প্রতিবিম্ব থাকলেও জীবনের স্পন্দন থাকে না।

সাধারণতঃ পরিচিতি জগতের ও দৈনন্দিন

জীবনের ব্যবহার্য বস্তুর ছবি লোক শিল্পে স্থান পায়। যদিও লেঋাক শিল্পীর মান গঠনে এবং চিত্র নির্মানে তেমন প্রশিক্ষণ থাবে না। চিন্তা ও কর্মের অভাব থাকায় চিত্র বস্তুর স্থুলতাই ধরা পড়ে তাতে সুক্ষ্ম ব্যঞ্জনা নেই।

লোকশিল্পীরা চিত্রের বিষয় নির্বাচন করেছেন প্রকৃতি থেকে, যেমন -গাছ, পাতা, ফুল, ফল জীব জগত থেকে মানুষ পশু-পাখি, মাছ ও কীটপকতঙ্গ, আর সৌরজগত থেকে সূর্য, চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি চিহ্নিত হয়।

মনন ও চিন্তার অনিবার্য ফলশ্রুতি এ লোক শিল্প।

গৃহস্থালীর কাজে কুলা, ডালা, সরতা, মই, লাঙ্গল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

পুকুর ডোবা, খাল-বিল পদ্ম বা শাপলার অন্ত নেই। এ ফুলের সাথে নরনারীর অহরহ পরিচয়। সুতরাং চিত্রে পদ্মের আকার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। কল্কা একটি জনপ্রিয় মটিকা কাঠপাথর প্রভৃতি ভাবকরণে বর্কি মটিকও দেখা যায়- যেমন হাতি, ঘোড়া, হরিণ, মাছ প্রভৃতি। বুটি বয়ন শিল্পে জ্যামিতিক নকশা চোখে পড়ে। যেমন - পাখা , পাটি মসলিন, জামদানী শাড়ী ইত্যাদিতে দেখা যায়।

উন্নত বা আধুনিক চিত্রের বিভাজন করা হয় রং তুলির দিক থেকে। যেমন তৈল চিত্র জলরং ইত্যাদি। চিত্ররূপ থেকেও তার স্বাতন্ত্র আছে। যেমন - পোর্টেও, ল্যান্ডস্ক্যাপ ইত্যাদি। লোক শিল্পকে অংকনের উপকরণ বা চিত্ররূপের ভিত্তিতে বিভাজন করা যায় না। এর বিভাগ আসে আধার বা ক্যানভাসের দিক থেকে। কাঁথার জমিনে চিত্রিত ছবি সুচিকর্মের বিষয়। লোকসমাজে এগুলো নকশী কাঁথা নামে অভিহিত। রং ও রেখার সমন্বয় থেকে আল্পনা এসেছে। যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানের রেখাচিত্র কুলাচিত্র, পিড়িচিত্র প্রভৃতি। এ দৃষ্টিকোন থেকে আরও কিছু শিল্পের নাম করা যায়, যেমন -নকশী শিকা, নকশী পুতুল, অরা, কাসা-পিতল, অলংকার, সখের হাড়ি, লক্ষীর সরা, মঙ্গল ঘট, নকশী পিঠা, সন্দেশ ও আমসত্বের ছাঁচ। চিরুণী মুখোশচিত্র, দারুচিত্র অঙ্গচিত্র প্রভৃতি।

এ লোক শিল্পগুলো কোনটি কত প্রাচীন তা ঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়নি। কারণ এগুলো নিদর্শন কোথাও রক্ষিত হয়নি। কেবল পরোক্ষভাবে এর একটা সম্ভাব্যকাল অনুমান করা হয়।

লোক শিল্পের কারিগর ও শিল্পীর গ্রামেরই খেটে খাওয়া মানুষ। মনন ও চিন্তার অনিবার্য ফলশ্রুতি এ লোক শিল্প। এতে হয়েছে বাংলার পরিবেশ সমাজও সৌন্দর্য বোধের চমকপ্রদ ও বাহারী দৃষ্টান্ত। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি তথা জাতিতাত্বিক বৈশিষ্ট্য নিরূপনে লোকশিল্পের নিদর্শ সমূহের আমাদের বারবার ফিরে যেতে হয়।

শৈলী নিসার

তারুন্যের উৎসব-বই মেলা

বইমেলা। যেন তারুণ্যের উৎসব। ক্রেতা, বিক্রেতা, লেখক, দর্শক সবাই তরুণ। তরুণরাই এ মেলার প্রাণশক্তি। রাত- দিন খেটে স্টল সাজিয়েছে তারা। তারপর বই, ক্যাসেট, নানা পণ্যসামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসেছে। দু'এক জন তরুণ লেখক ষ্টলে বসে নিজেদের বই নিজেরাই বিক্রি করছে। বিক্রি-বাট্টা কম হলেও উৎসাহে ভাটা পড়ছেনা কারও। পূর্ণ উদ্দোগে কাজ করে যাচ্ছে সবাই। ওদের সময় কাটছে স্বতঃস্ফূর্ততায়।

আর রয়েছে পাড়ার রংবাজ তরুণটি। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গলির মোড়ে ছিল যার আড্ডা। সুন্দরী মেয়ে দেখলে শিস দেয়া, অশালীন মন্তব্য করে পিছু নেয়া ছিল যার। টাইমপাস' এর অন্যতম বিষয় বস্তু। পড়াশোনায় মন নেই সারাদিন মাস্তানি করে রাতে নেশা বুঁদ হয়ে বাড়ি ফেরা -এই ছিল যার কাজ। সে-ও এসেছে বইমেলায়। স্টল নিয়েছে। দিব্যি বিকিকিনি করছে। সুন্দর কাটছে সময়।

এ বইমেলা শুধু বই বেচা-কেনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা। বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে যায় এখানে। স্টল থেকে বই, ক্যাসেট চুরি তো নিত্যকার ঘটনা। তারওপর উৎপাত বেড়ে যায় এক শ্রেণীর বখাটে তরুণদের। দলবল নিয়ে হাজির হয় মেলায়। নিয়ম ভাঙাই যেন তাদের নিয়ম। কারও

বাধা-নিষেধ মানেনা। চোখে-মুখে ড্যাম কেয়ার ভাব স্পষ্ট। মেয়েদের আশে পাশে ঘুরঘুর করে। পেছন থেকে ঢিল ছুড়ে। ওড়না ধরে টান দিয়ে কৃতিত্ব খোঁজে। হয়তো কোন মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ করে পা বাড়িয়ে দিল সামনে। হোঁচট খেয়ে পড়ে মেয়েটি। এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার সাহস নেই কারও। প্রতিবাদ করতে গেলেই ঘটবে হুলুস্থুল কান্ড। বেধে যাবে মারামারি সেই থেকে হয়তো খুনোখুনি কিংবা স্টলে আগুন লাগিয়ে দেয়া।

প্রতিদিন হাজার হাজার তরুণ-তরুণীদের সমাগম হয় বইমেলায়। উচ্ছলতায় ভরা এক একজনের মুখ। সমাগম হয় বইমেলায়। উচ্ছলতায় ভরা এক একজনের মুখ। দল বেধে মেলায় ঢুকছে। আড্ডা দিচ্ছে। ঘোরাঘোরি করছে সারা দিনভর। খোঁজ করছে, নতুন কি কি বই এলো। যাবার সময় কিনে নিয়ে যাচ্ছে এত্ত বই। কোন কোন ষ্টলে দেখা যায় প্রচন্ড ভীড় জমিয়েছে পাঠকরা। হাসিমাখা মুখে লেখক কথা বলছেন ভক্তদের সাথে। অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। নিজেকে ধন্য মনে করে ফিরে যাচ্ছে প্রত্যেকে।

আমাদের তরুণের কর্মপাগল। কাজ চাই কিন্তু বিধিবাম। বেকারত্বের আগুনে প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয় তারা। মাষ্টার্স পাস করেও চাকরি নেই। বই মেলায় ছুটে যায় মৌসুমী কাজে। দুপুর থেকে রাত অবধি চলে মেলা। এ সময়টা ভীষণ ব্যস্ত থাকে তরুণেরা। কিন্তু মেলা শেষে আবার শুরু হয় সেই ভবঘুরে জীবন। চাকরি ছেড়ে বর্তমানে ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ছে অনেকে। কার্ব মার্কেটে আজ তরুণদের সংখ্যাই বেশি। রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখেছিল অনেক তরুণ। শোনা যায়, ছিনতাই রাহাজানী আর সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী তরুণরাও নাকি পথ ছেড়ে সৎ পথে আয়-রোজগারের দিকে পা বাড়িয়ে ছিল। কিন্তু শেয়ার মার্কেট হতাশ করে তাদের। আবার সেই অন্ধকার পৃথিবীতে ফিরে যায় তারা। এ সমস্ত মৌসুমী কাজের পেছনে না ছুটে স্থায়ী কোন কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে হয়তো এমনটি ঘটতনা। আর এজন্য এগিয়ে আসতে হবে সমাজের মানুষকে। সর্বোপরি দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক - তরুণদের।

প্রযুক্তি

ইন্টারনেটের সাতকাহন

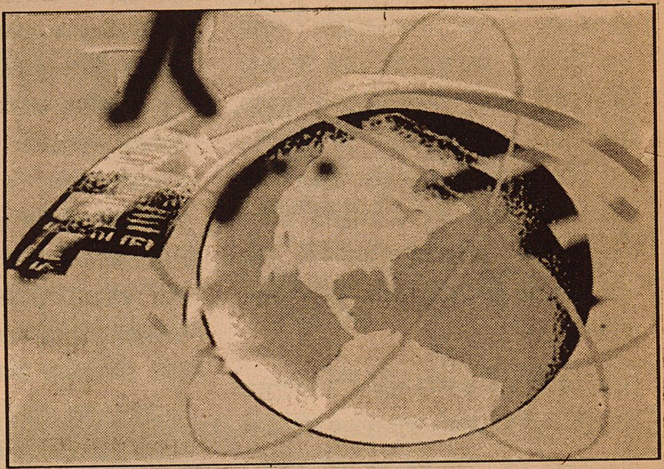

এম সি আই মেইল ধরে ইলেক্ট্রনিক প্যাকেট লন্ডন হতে সোজা ফ্রান্সে চলে এলো মনি। চোখের সামনে ভেসে উঠল চমৎকার সব নাম-ধাম। বৈচিত্রপূর্ণ কোলাহল মুখর নেটওয়ার্কের সাথে ঘটল পরিচয়। কথা হলো ফ্রান্সের বাঘা বাঘা সব বিজ্ঞানীদের সাথে। পথ চলতে গিয়ে দেখা হল ল্যাঘবার ঘেয়ারের সাথে। ঘেয়ার নিজস্ব এক আড্ডায় দাওয়াত করলেন মনিকে। কিন্তু মনি তখন ইতালীতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ভূ-মধ্যসাগরের নীল সলিলে পা ডুবিয়ে মনি পৌঁছে গেল ইতালিতে। রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী ছাত্র সাগরকে ছুঁড়ে দিল ছোট একটি ম্যাসেজ। ই আর নেটে চেপে এক মিনিটের মধ্যে মনি পৌঁছে গেলে কলিকাতায়। খড়গপুর আই আই টি'র ছাত্রী শিমুর সাথে চালাল তিন মিনিট আড্ডা। মনির আর ভাল লাগছিল না ঘুরতে। দীর্ঘ দশ মিনিট ধরে ঘুরে এলা লন্ডন, ফ্রান্স, ইতালী, কলিকাতা। এ চারটি দেশে যেতে একবারও মনির ঘরের চেয়ার ছেড়ে উঠতে হয় নি। শুধু কম্পিউটার মাউসে ছিল হাত। যাত্রার বন্ধু ছিল মডেম। মনির এই দশ মিনিটের যাত্রায় খরচ হয়েছে মাত্র ২ ডলার।

না উপরের এই অংশটি কোনো কল্পকথা নয়। নয় কোন আষাঢ়ে গল্প। এটি ইন্টানেট তথা তথ্যের মহারাজপথে ভ্রমনের ছোট একটি চিত্র। নিজের রুমে বসে কম্পিউটারের সাহায্যে যে কেউ বেড়িয়ে আসতে পারেন বিভিন্ন দেশ। জানতে পারেন তথ্য। খবরা-খবর ও দেয়া নেয়া চলতে পারে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সাথে।

গোড়ার কথা

সালটি ছিল ১৯৬৯। পৃথিবীতে দুই পরা শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তখন চলছে ঠান্ডা লড়াই। টানটান উত্তেজনা। দু'দেশই খুব বুঝে শুনে এগুচ্ছো কেননা, একটু বেচাল হলেই পড়বে হাইড্রোজেন বোমা। ধ্বংস হয়ে যাবে যে কোনো একটি দেশ। ভেঙে পড়বে যোগাযোগ ব্যবস্থা। প্রচন্ড ভয়ে তটস্থ তখন দু'দেশ। মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তরে তখন পুরোদমে চলছে কম্পিউটারের ব্যবহার। যাবতীয় তথ্যের আদান-প্রদান পেন্টাগনে চলতো নিজেদের মাঝে। বিশেষজ্ঞরা ঠিক চ্যানেলে না রেখে তাকে বিভিন্ন চ্যানেল ছড়িয়ে দিতো। এতে সুবিধা এই যে, কোনও চ্যানেল ধ্বংস হয়ে গেলেও তথ্য চলে যাবে অন্য চ্যানেলে। পেন্টাগণকে তখন একটি পথের উপর নির্ভর করতে হবে না। কাজটি শুরু হলো অভুতপূর্ব সাফল্য এলো। ইন্টারনেটের বীজ এভাবেই রোপিত হলো।

১৯৮৩ সালেও যেখানে সারা পৃথিবীতে ৫০০টি মূল কম্পিটার যুক্ত ছিল ইন্টানেটে। '৯৫ সালে তা ছিল ৪৫,০০০। সংযুক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত ১৬০টি দেশ। এই শতকের শেষে এই সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়াবে ২০ কোটিতে। প্রতিদিন বেড়েই চলেছে ইন্টারনেট সংযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। অচিরেই ইন্টারনেট হয়ে উঠবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় যোগাযোগ ব্যবস্থা। তথ্যের এ রাজপথে আপনি অবলীলায় হেঁটে যেতে পারেন। কোনো বাধা পাবেন না আপনার সামনে। সেকেন্ডের ব্যবধানে চলে যাবেন পৃথিবীর এক কোণ থেকে আরেক কোণে। নীচে থেকে উপরের দিকে। অবশ্য এজন্য চাই আপনার ইচ্ছা। তারপর একটি পিসি, একটি মডেম আর একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। অনেকের মনে হতে পারে মডেম কী ? মডেম হলো সংকেত পাঠাতে এবং সংকেত গ্রহণ করে সংকেতের নিজস্ব চেহারা দিতে সক্ষম একটি যন্ত্র।

পাওয়া যাবে যে সুবিধা

ইন্টারনেটের সুবিধাটা আসলে কোথায় ? তার উত্তর কয়েক কথায় দেয়া অসম্ভব। মনে করুন, আপনি ঢাকা থেকে লন্ডনের কোনও অফিসের বড় কর্তার সাথে কথা বলতে চান। টেলিফোন ঘোরাতে ঘোরাতে অনেক সময় ব্যয়ে হয়তো তাঁর লাইনটি আপনি পেলেন। অপর প্রান্ত থেকে হয়তো শুনবেন, এই মাত্র উনি বেরিয়ে গেলেন বা অফিসের কাজে বাইরে, বা টেবিলে নেই। অজুহাতের শেষ নেই। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে এ জাতীয় ঘটনা পৃথিবীতে প্রতিদিন ঘটে শতকরা ৭৫ ভাগ। কিন্ত তারপরও আপনার তাকে দরকার। ফলে আবার ডায়াল। আবার হয়তো একই কথা। নয়ত অন্যকিছু। মোটা অংকের টাকা বেহুদা জলাঞ্জলি। কিন্তু ইন্টারনেট থাকলে আপনার ম্যাসেজটি কম্পিউটারে লিখে, যার কাছে পাঠাবেন তাঁর নাম্বার ডায়াল করুন। লাইন পেলেই অন্য প্রান্তের কম্পিউটারে চলে যাওয়ার সময় কাঙ্খিত ব্যক্তি তাঁর চেয়ারে না থাকলেও কিছু হবে না। পরবর্তী সময়ে চেয়ারে ফিরে সে কম্পিউটারে চলে যাওয়ার সময় কাঙ্খিত

ব্যক্তি তাঁর চেয়ারে না থাকলেও কিছু হবে না। কম্পিউটার অন করলেই আপনার সে পাঠানো মেসেজটি পেয়ে যাবেন। তাঁর কম্পিউটারের সাথে প্রিন্টার থাকলে তো কথাই নেই তিনি আপনার ম্যাসেজের প্রতিলিপিও করে নিতে পারবেন।

টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, থেকে ইন্টারনেট অনেক সক্রিয় এবং সুলভ ঝুট ঝামেলা মুক্ত। তারিয়ে তারিয়ে কফি খেতে খেতে বৈঠক-আড্ডা সেরে নিতে পারেন লস এঞ্জেলেসের পড়ুয়া বন্ধুটি সাথে, আবার সেরে নিতে পারেন ব্যবসার দরকারী আলাপ-আলোচনা। পাঠাতে পারেন নিজের গবেষণার তথ্যাদি। ঠিক একইভাবে পেতে পারেন অনেক কিছু।

> **সোজা কথা পুরো বিশ্বটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিচ্ছে ইন্টারনেট। নিঃশব্দে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব ঘটাচ্ছে।**

পড়া, দেখা, শোনা সবই ইন্টারনেট লাইনে রয়েছে। ধরুন, আপনি বাংলাদেশে বসে মার্কিন কংগ্রেস লাইব্রেরীর বই পড়তে চান বা প্রিয় শিল্পীর কোনো বিখ্যাত মুভি'র উত্তেজনাময় অংশগুলি দেখতে চান, সবই করতে পারবেন যদি আপনার কম্পিউটারটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে। সোজা কথা পুরো বিশ্বটাকে হাতের মুঠোয় এনে দিচ্ছে ইন্টারনেট। নিঃশব্দে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব ঘটাচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট

বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটকে নিয়ে চলছে তুমুল হৈ, চৈ, ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমা মুলুকগুলোতে এটি ছিল কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ছিল এর বিচরণ। অথচ '৯৫ সাল পেরুতে না পেরুতে ইন্টারনেট তাঁর পূর্বেকার গণ্ডী পেরিয়ে এলো। বিশ্বজুড়ে এর জাল বিস্তৃত হতে লাগল। টেলিফোন কিংবা চিঠি প্রেরণ, করফারেন্সিং অথবা সরাসরি বিপনন শিক্ষা-গবেষণা কিংবা অফিস ব্যবস্থাপনা, টিভি সম্প্রচার অথবা প্রতিরক্ষা ইত্যাদিতে একত্রিত করল ইন্টারনেট। জনপ্রিয় হলো মুহুর্তে। বহুমাত্রিক যোগাযোগের জন্য নাম পেল তথ্যের মহারাজপথ বা ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে।

পৃথিবীর বিখ্যাত লাইব্রেরী, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠা প্রতিরক্ষা দপ্তর, স্টক এক্সচেঞ্জসহ অগণিত ব্যক্তিগত স্থাপনা আজ পরস্পরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত। তাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে যে কেউ-ই আজ একটি কম্পিউটার, মোডেম আর টেলিফোন সংযোগের সাহায্যে এই রাজপথ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যটি যোগাড় করতে পারেন। ব্যাপারটি অত্যন্ত দ্রুততা এবং নামে মাত্র খরচেই সম্ভব।

কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য বিনিময়ের অপূর্ব এ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে বিশ্বের তথ্য অবকাঠামো বা GLOBAL INFORMATION INFRASTRUCTURE. পৃথিবীর যাবতীয় তথ্য ব্যবস্থাই যুক্ত হচেছ এর সাথে।

এই মহারাজপথে তাই যার অবস্থান যত দৃঢ় হবে জ্ঞানের ভাণ্ডারে তার বিচরণ তত বেশি হবে। এছাড়া ভবিষ্যতে বিশ্বে টিকে থাকা দুঃসাধ্য। শুধু উন্নত বিশ্বই নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোও পারছে এ সত্যটুকু উপলব্ধি করতে। আটঘাট বেধে তাই মহারাজপথে নিজের অবস্থান বলিষ্ঠ করতে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়ছে দিকে দিকে। প্রতিনিয়তই এ জালে নতুন তার বুনন হচ্ছে।

আসছে ইন্টার অ্যাক্‌টিভ

ইন্টারনেট হচেছ নেটওয়ার্কগুলোর নেটওয়ার্ক। ইন্টারঅ্যাকটিভ হলো কোনও একটি নেটওয়ার্ক সেন্টারের বিনোদন, খবরা-খবরসহ বিশ্বের তারা তা রকমারী অনুষ্ঠানাদি জমা থাকবে। সেই নেটওয়ার্কে আপনি যুক্ত থাকলে ওদের সংগ্রহে থাকা সবকিছুই দেখতে পাবেন। অবশ্যই যখন যেটি ইচেছ। ওই নেটওয়ার্কে যদি বিনোদনের আইটেম বেশী থাকে এবং নতুন নতুন উপকরণাদী প্রতি মুহুর্তে যুক্ত হয় তবে আপনার পোয়াবারো। হালসপ্তাহের হিট মুভি'টিও দেখতে পারছেন। ভালো না লাগলে সেটি পরিবর্তন করে বাপ-দাদার আমলের ছবিও দেখতে পারেন। এজন্য মাউস ক্লিক্‌ই যথেষ্ট। অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে ভালো না লাগা অংশটুকু আপনি বাদ দিয়ে পরবর্তী অংশটুকু দেখতে পারেন। আবার, ভালো লাগা অংশটুকুও বার বার বিভিন্নভাবে আপনি দেখতে পারেন। সোজা কথা অপনার ইচ্ছাই সব। অন্যের ইচ্ছে চাপবে না আপনার ওপর। এ ধরণের টিভি'কে বলা হচ্ছে ইন্টারঅ্যাকটিভ টিভি। ইন্টারনেট লাইনেই পাচ্ছেন এ টিভি। বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কতগুলো প্রতিষ্ঠান চালু করেছে এ টিভি। জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারসাথে পাল্লাদিয়ে বাড়ছে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা। দর্শকরা বা গ্রাহকরা তাই প্রতিদিনই পাচ্ছে নতুন স্বাদের, বিভিন্ন আঙ্গীকের সব অনুষ্ঠান। এ শতাব্দীর শেষপ্রান্তেই হয়ত এটি সারা বিশ্বকে চমকে দেবে। ইন্টারনেট লভ্য হলে ইন্টার অ্যাকটিভ হবে লভ্য।

তথ্য প্রযুক্তির মহাসরণীতে ১৬০টি দেশের অন্তর চার কোটি মানুষ যুক্ত আছে। প্রতিবছরই এই সংখ্যা হচ্ছে দ্বিগুণ। খোদ মার্কিন মুলুকে এ সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এক তৃতীয়াংশ পরিবারে আজ রয়েছে কম্পিউটার, অফিসে আর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও আছে প্রায় সব কর্মীর জন্য। ইউপরোপ আর পূর্ব এশিয়ার নব্য শার্দুলেরা আমেরিকাকে অল্পদিনের মধ্যে ধরে ফেলার উপক্রম করছে। বলা হচ্ছে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ পৃথিবীতে তথ্য মহাসারণীতে যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে হবে আজকের চেয়ে দ্বিগুণ।

> **অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে ভালো না লাগা অংশটুকু আপনি বাদ দিয়ে পরবর্তী অংশটুকু দেখতে পারেন। এজন্য মাউস ক্লিক্‌ই যথেষ্ট।**

বাংলাদেশে ইন্টারনেট

বাংলাদেশের টেলি মনোপলি সারকারী প্রতিষ্ঠান টি এন্ড টি VSAT এর ভর দিয়ে বাংলাদেশও চলে গেছে তথ্যের মহাসরণিতে। টি এন্ড টি প্রদত্ত ভি স্যাট-এর গতি ৬৪ কেবিপিএস। ব্যবহারকারীর প্রান্তে তা ৯.৬ থেকে ১৪.৪ কেবিপিএস এসে পাওয়া যায়। সংযোগের গতি নির্ভর করে অবশ্য স্থানীয় টেলিফোন লাইনের উপর। সেদিক দিয়ে বাংলাদেশ এখনও বিশ্ব থেকে কয়েক দশক পিছিয়ে।

আই এস এন বা ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক প্রথম ঢাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান শুরু করে। এর সাথে যোগ দেয় বেক্সিমকো সহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। অনলাইন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদান শুরু করে গ্রামীন সাইবারনেট। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তিকে পৌছে দিতে পারলে প্রচুর কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে, চাকরির সুযোগ মিলবে। শিক্ষিত, ড্রপ-আউট শিক্ষার্থী এমনকি অশিক্ষিত অনেক পর্যায়ের বেকারের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ধারণাকে লালন করে গ্রামীণ সাইবারনেট কাজ করছে।

টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তারের লাইন টানার আর দরকার নেই। যেখানে খুশী সেখানে সেলুলার টেলিফোন ব্যবহার করা সম্ভব। এতে করে গ্রামের কৃষক তাঁর উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কোন এলাকায় বেশি তা জানতে পারবে। আবার পণ্যের চাহিদা যার তিনি তাৎক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে তার কাঙ্খিত পণ্যের মজুদ কোথায় জানতে পারবেন। এমনকি দেশের বাইরে বসেও গ্রাম অঞ্চলের খবর নেয়া সম্ভব। যে কোনো সময় প্রবাসী তাঁর গ্রামের বাড়ির সাথে কথোপকথন সেরে নিতে পারেন। গ্রামীন সাইবারনেট, এখাতেও গ্রামীন জনসাধারণকে দিচ্ছে সুবিধা।

বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি পত্রিকা তথ্যের মহাসরণিতে পা রেখেছে। সময়ের সাথে সাথে এ সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাধারণের মধ্যে সহজলভ্য হয়নি কম্পিউটার। ফলত ইন্টারনেট বাংলাদেশে পারছে না বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ভ্রমণ করতে। খরচের খাতাও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারী। তাই অনেক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলেও খরচের কথা ভেবে পিছিয়ে আসছে। এভাবেই আমরা চলমান বিশ্ব থেকে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রায় দশ বছর পিছিয়ে। অথচ ভারত গত কয়েক বছরে এ খাতে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছে। সতিই তাই। প্রায় সকল জেলায় ভারত ছড়িয়ে দিচ্ছে ইন্টারনেট জাল। সফটওয়্যার রপ্তানী ও ডাটা এন্ট্রি শিল্পে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।

১৯৯৬ সালে অনলাইন ইন্টারনেট চালু হলেও এখনও কম্পিউটারের মূল্য সাধারণের ধরাছোয়ার বাইরে। ডিজিটাল ফোন লাইনও ততটা প্রসার পায়নি। ইন্টারনেটের আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি এখনও ব্যয়বহুল। যা সাধারণ জনগণের নাগালের বাইরে। অনেকে মনে করছেন কম্পিউটার শুল্কমুক্ত হলে ব্যয় খানিকটা কমে আসবে।। তাহলে হয়ত ইন্টারনেটকে বাণিজ্যিক, বিনোদন উভয় মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে।

আশ্রাফ আবির

যুদ্ধ এসে থেমে গেছে বন্ধুত্বে

শেষ বারের মতো ঈসা খাঁ চারদিকে দেখে নিলেন। যুদ্ধের নিশানগুলো পত্ পত্ করে উড়ছে বাতাসে। ঈসা খাঁ নিজের তলোয়ারটা দেখে নিলেন। নিখুঁতভাবে তিনি প্রস্তুতি নিয়েছেন আজকের জন্য। কোথাও কোন ফাঁক নেই। এগার সিন্ধু, টোব, রনভাওয়াল নিয়ে তিনটি এলাকা জুড়ে ঈশা খাঁ তার যুদ্ধের কৌশল খাটিয়েছেন। পশ্চিম দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র নদীটা তিনটি গ্রামকে চিরে পূর্ব দিকে দূরে মিলিয়ে গেছে। নদীর বাতাসের ঝাপটা লাগছিলো মুখে।

১৫৯৭ সাল। সম্রাট আকবরের অন্যতম শত্রু ঈশা খাঁকে পরাজিত করার জন্য যখন তাঁর এক একটা আঘাত ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছিলো ঠিক তখনই তার শেষ অস্ত্র হিসেবে মানসিংহকেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

বাংলার সুবেদার মানসিংহ অনেকক্ষণ থেকেই ঈশা খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন নদীর ওপার থেকে। তার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। তিনদিক থেকে আক্রমণ সাজিয়েছেন তিনি। তার অনেকদিনের অভিজ্ঞতার এই রণকৌশলে কোন ফাঁক ফোকর রাখেননি তিনি।

নদীকে মাঝখানে রেখে দুদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। দু'জনেরই তরবারী সূর্যের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তারপরে অসংখ্য তীর। কান ফাটানো আওয়াজ। আর্তনাদ। রক্তাক্ত উল্লাস।

কেউই নদী অতিক্রমের চেষ্টা করলো না। ঈসা খাঁ শুরু থেকেই একটু চিন্তিত ছিলেন। তার সৈন্যরা নদীর উত্তর তীরে এগার সিন্ধুতে। আর মান সিংহের সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছেন নদীর দক্ষিণ তীরে টোকের মুখোমুখি। ঈসা খাঁর ডানে ও সামনে ব্রহ্মপুত্র নদ। পেছনে খাল ও ডোবা নালা। সেক্ষেত্রে মানসিংহ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। নদীর দক্ষিণ তীরে উঁচু এলাকা।

পরদিন পর্যন্ত যুদ্ধ গড়ালো। কিন্তু কোন পক্ষেরই যার যার সুবিধাজনক অবস্থান ত্যাগ করে নদী অতিক্রম করার কোন উদ্যোগ দেখা গেলো না। এ অবস্থাতে ঈসা খাঁ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। উভয় পক্ষেরই বেশ কিছু সৈন্য ইতিমধ্যেই অকেজো হয়ে পড়েছে।

মান সিংহ লক্ষ করলেন একজন প্রত্রবাহক সাদা পাতাকা হাতে তার দিকে এগিয়ে আসছে। পথে রক্ষীরা আটকালে মানসিংহ অনুমতি দিলেন। ঈসা খাঁর পত্রবাহক কোমরে গুঁজে রাখা ঈসা খাঁর পত্র

মানসিংহকে পড়ে শুনালেন। পুরোটুকু শুনে মানসিংহ ভ্রু-কুচকালেন। মানসিংহ তখন মল্ল যুদ্ধে রাজি হয়ে ঈসা খাঁকে আহ্বান জানালেন।

নদীর পশ্চিম দিকে রনভাওয়াল গ্রাম। বেশ কিছু খোলা ময়দান। ঈশা খাঁ মানসিংহ মুখোমুখি। কারও মুখে কথা নেই। হাতে কোষমুক্ত ঝক্‌ঝকে তলোয়ার ঝিলিক দিচ্ছিলো। নদীর অন্য দুদিকে সৈন্য সামন্ত এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো তাদের মুখ থেকে শব্দই বের হচ্ছিল না।

ঈশা খাঁ মৃদু স্বরে বললেন "নিন, আমার তলোয়ার গ্রহণ করুন। আমি নিরস্ত্র শত্রুর সাথে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করি না।"

আর একবার ঝিলিক দিয়ে প্রচন্ড শব্দে ঈশা খাঁ প্রথম আঘাত করলো মানসিংহের কাধ বরাবর। মান সিংহ এতটাই নিখুতভাবে সরে দাড়ালো, ঈশা খাঁ কিছুক্ষণের জন্য বেসামাল হয়ে পড়লো। ওই একবারই। দুজনের প্রচন্ড আক্রোমন একে অন্যের উপর ফেলতে লাগলো। সূর্য তখন মাথার উপর উঠে এসেছে। হঠাৎ ! ঈশা খাঁ প্রচন্ড শক্তি দিয়ে মানসিংহের ঘাড় বরাবর লক্ষ্য করে আঘাত করলো। ঈশা খাঁর আঘাতটা এতটাই জোরে ছিলো যে মান সিংহের তলোয়ার দ্বিখণ্ডিত হয়ে ছিটকে পড়লো। হতবাক বাংলার সুবেদার মানসিংহ। বিস্ফোরিত চোখে নেতার পরাজয় ঘনিয়ে আসতে দেখলো সৈন্যরা, মানসিংহের নদীর ওপারে দাড়িয়ে থাকা উল্লাসে ফেটে পড়লো ঈসা খাঁর সৈন্যাবাহিনী।

আশ্চর্য্য। ঈশা খাঁ তার কোমরবন্ধ কোষ থেকে দ্বিতীয় তলোয়ারটি ছাড়িয়ে নিয়েছে ততক্ষণে। এগিয়ে দিলো মানসিংহের দিকে। ঈশা খাঁ মৃদু স্বরে বললেন "নিন, আমার তলোয়ার গ্রহণ করুন। আমি নিরস্ত্র শত্রুর সাথে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করি না।"

বিচলিত মূঘল সম্রাট আকবরের বিস্বস্ত বাংলার সুবেদার মানসিংহ হতবাক। মানসিংহ ঈশা খাঁর এমন মহান ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে বললেন - এমন মহান লোকের সাথে আমি আর যুদ্ধ করতে চাইনে। আজ আমরা পরস্পর বন্ধু আর শত্রুতা নয়। ঈশা খাঁ বুকে জড়িয়ে ধরলেন মানসিংহকে।

মানুষ তার আশার সমান বড়
ইতালীয় প্রবাদ।

সাইফুর রহমান তারিক

ন্যাটো ঃ নয়া বিশ্বে নয়া রূপে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিশ্বনেতৃত্ব একটি সম্মিলিত উপলব্ধিতে পৌছেছিলেন বিশ্ব নিরাপওার জন্য একটি যৌথ প্রয়াস দরকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মমী, ইতালী এবং জাপানের মধ্যে যে যুদ্বংদেহী ঐক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল তদ্রুপ কোন যুদ্ব জোট আবারো গড়ে উঠবে না, এমন আশ্বাসে স্থির হতে পারছিলেন না ফ্রান্সে, ব্রিটেন এবং মার্কিন নেতৃত্ব। তৎকালে, অন্যান্য দেশ সমূহ ও ধীরে এই যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ধারনা গ্রহন করেছিলেন, মনে মনে অসফলতার আশংকা থাকা সত্ত্বেও। তখনও প্রায় গোটা দুনিয়া জুড়ে উপনিবেশিক শাসন চলার কারণে উপরোল্লিখিত নেতৃত্ব চিন্তা-চেতনা ঔপনিবেশিক প্রশাসন সূত্রেই উপনিবেশ সমূহেও বিস্তৃত হয়ে ছিল। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী একটা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার পরিস্থিতি তৈরী হল। ১৯১৯ -এ প্রতিষ্ঠিত হল League of Nations বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। এর পরবর্তী প্রভাব যাই হোক মানব ইতিহাসে এ ধরনের যৌথ নিরাপত্তার এ ধরণের সর্বব্যাপী আনুষ্ঠানিক প্রয়াস এই প্রথম। মানবমনে প্রেরিত হল যৌথ নিরাপত্তা তথা কালেকটিভ্ সিকিউরিটির ধারণা।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু এ ধারণাকে গুড়িয়ে দিল। দেখা দিল নিরাপত্তা সংকট। আসলে নেতৃত্বের সঠিক কর্মপন্থার উদ্ভাবনে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই এমনটি ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে ব্রিটেনসহ জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা চাষীদের তোষণ নীতি (Policy of Apcasement) মূল বিপত্তিটা ডেকে এনেছিল। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। সম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির শ্যাম রাখি না কুল রাখি মনোভাবের কারণে জার্মানী সুযোগ খুঁজে পেয়েছিল। ঐ দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোর সমাপ্তির পর যে বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তার ফলে ফ্রান্স সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল বেশী। জার্মানী হয়েছিল নিগৃহীত, যদিও যুদ্ধের সিংহভাগ দ্বায় তারই ছিল হিট এই অযুহাতেই নতুন যুদ্ধান্মদানা ছড়িয়ে দিয়েছিল। যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতিপুঞ্জেরও অকাল প্রয়ান গঠিত হয়েছিল। অতঃপর দিন গড়িয়ে গড়িয়ে ১৯৪১ সাল। আগষ্টে স্বাক্ষরিত হল আটলান্টিক চার্টার -রুজভেল্ট এবং চার্চিলের মধ্যে। পরবর্তীকালে জাতিসংঘ বা United Nation এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল। অতঃপর চীন, রাশিয়া, মার্কিণ যুক্তরাস্ট্র, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনকে স্থায়ী সদস্য করে গঠিত হল জাতিসংঘ - ১৯৪৫ এর ২৫ এপ্রিল সানফ্রানসিসকোতে বসেছিল উদ্ধোধনী অধিবেশন, উপস্থিত ছিল ৪৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি।

যৌথ নিরাপত্তার ব্যবস্থায় আরো একধাপ অগ্রসর মানুষ। তবুও এত ব্যাপক নিরাপত্তা সীমানায় আটকে থাকেনি নেতৃত্বে। আদর্শ এবং স্বার্থের দ্বন্ধে কিছুটা সংকুচিত মাত্রায় নিজ নিজ আধিপত্য বলয় গড়ে তুলল পরাশক্তি। কতক বাস্তবতার নামে। এ পর্যায়ে শুরুটা হয়েছিল ন্যাটো দিয়ে, ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল। উত্তর আটলান্টিকে নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষে, অবশ্য জাতিসংঘ সনদ মোতাবেকেই তা হয়েছিল।

কিন্তু কেন এমন ব্যবস্থা কারণটা বুঝা যায় সহজেই। ইতিমধ্যেই দু'টো পক্ষ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশ গুলো হুমকি বোধ করল রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক বলয়ের কাছ থেকে। জাতিসংঘের যৌথনিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটা ফাটল ও দেখা দিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রক্রিয়ার নায়ক। অপর দিকে সোভিয়েত বলয়ও ন্যাটোর আবির্ভাবে ভীত হল, শংর্কিত হল। তারাও গড়ে তুলল ওয়ারেশ জোট -১৯৫৫ সালের ১৪মে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের আটকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র মিলে চুক্তি স্বাক্ষর করল। ফলে এ বিষয়টি পরিস্কার যে বিশ্বব্যাপী ইউ. এন ঘোষনার আড়ালে ন্যাটোর জন্ম যতটা না নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষে তারও বেশী এর ভূমিকা ঠান্ডা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনায়। দু'টো জোটের উৎপত্তিগত সময়ের ব্যবধান থেকে তা বুঝা যায়।

০২.

মোটামুটিভাবে ন্যাটোকে বিবৃত করলে, এভাবেই করা যায়। ইতিহাসের ধারাক্রম এরকমেরই। পাঠক অবশ্য নিজগুনে সত্য-দর্শন করতে পারেন তার যুক্তিতে। তবে ঘটনাপঞ্জীর ক্রম এর বাইরে নয়। বলা যায় ঐতিহাসিক কালসূত্রেই নিজ নিরাপত্তার নামে ন্যাটো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিল ঠান্ডাযুদ্ধের বার্তাবরন, কালে যার, সম্প্রসারণ ঘটেছে। ন্যাটোর আদলে যখন CENTO বা CENTRA TREATY ORGANIZATION এবং SEATO বা CSOUTH EAST ASIAN TREATY ORGANIZATION গড়ে উঠে তখন এমন ধারণা আরো জোরদার হয়ে উঠে। দু' ক্ষেত্রেই মার্কিন মাতব্বরী স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও কাল পরিক্রমায় সেন্টো সিয়াটোর কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তথাপি গোটা ৬ -এর দশক এ দু'টো সংস্থার কার্যক্রম বিশ্বে উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিল যথেষ্ট মাত্রায়। ন্যাটোর ছায়া হিসাবেই এশিয়া মহাদেশে, ভারত সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরে এদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। এক সময় পাকিস্থানের অংশ হিসাবে আমরাও সিরাটোর সদস্য ছিলাম। যার ফলে, পাঠক, ইতিহাসের দায় আমাদেরও উপরেও বর্তায় বৈ কি। এভাবে দিন গড়িয়ে সামনে এল ৮ এবং ৯-এর দশক। ৮ এর দশকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে আদর্শগত এবং কর্মসূচীগত সংস্কার সাধন শুরু হয়েছিল। প্রথমে চীনে দেং জিয়াও পিং-এর নেতৃত্বে। পরে ১৯৮৫ সালের দিকে গর্বাচেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে। চীন অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে উপরে গেলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন এ কাজে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক

ঐতিহাসিক কালসূত্রেই নিজ নিরাপত্তার নামে ন্যাটো বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিল ঠান্ডাযুদ্ধের বাতাবরন, কালে যার সম্প্রসারণ ঘটেছে।

সংস্কার কার্যক্রম চালাতে গিয়ে যে গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রৈকা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল তা, এক কথা বলা যায়, মাঠে মারা গেল। ভন্ডুল হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবাতার নয়া বিনির্মান। এমনকি এখানে থেমে থাকলেও ভন্ডুল হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার নয়া বিনির্মান। এমনকি এখানে থেমে থাকলেওএকটা কথা ছিল। প্রক্রিয়া অগ্রসর হল আরো অনেকদূর। ১৯৮৯ -এ পোল্যান্ডে কমিউনিষ্ট সরকারের পতন ঘটল। ধীরে ধীরে, হাঙ্গেরী, চেকোস্লাভাকিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া এবং পূর্ব জার্মানীতেও ঘটল বিপর্যয়। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে ইয়েলেৎসিনের নেতৃত্বে শেষ আঘাতটি এল। ভেঙ্গে পড়ল সোভিয়ে ইউনিয়ন। ভেঙ্গে পড়ল সমাজতান্ত্রিক বিনির্মান। ওয়ারশ জোটের বিলুপ্তি ঘটল। এর ফলে অন্য একটি আশাবাদও তৈরী হয়েছিল। ভাবা হয়েছিল এবার ন্যাটোর বাস্তবতাও বিলীন হবে। যে নিরাপত্তার ধুঁয়া তোলে ন্যাট্যের জন্ম সে যুক্তি বহাল রাখার মত বাস্তবতা ১৯৯১ সালে শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ন্যাটো বিলুপ্ত হয়নি বরং সম্প্রসারিত হল এবং আরো সম্প্রসারনের পরিকল্পনায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে। ওয়ারশ জোটভুক্ত দেশ সমুহের মধ্যে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী এবং চেক প্রজাতন্ত্র (চেকোস্লোভাকিয়া ভেঙ্গে ইতিমধ্যেই দু'টো দেশ হয়েছে। -চেক প্রজাতন্ত্র এবং স্লোভাকিয়া) ন্যাটোর নতুন সদস্য পদ পেল। পূর্ব জার্মানী - জার্মানীর সাথে মিশে গিয়ে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছিল অনেক আগেই। নয়া বিশ্ব বাস্তবতায় ন্যাটো নবোদ্দ্যমে নিজের আয়তন বৃদ্ধি করে চলেছে। তাদের গোপন ভাবনা আচঁ করা যায় কিন্ বাহিরঙ্গে তারা যে যুক্তি প্রদর্শন করছে তা ধোপে টেকে না কিছুতেই।

০৩.

ন্যাটো উৎপত্তি পরবর্তী ঘটনাক্রমের দিকে এ পর্যায়ে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। উৎপত্তিকাল এবং উৎপকাল পরবর্তী যুক্তিতক্কো অনেক হয়েছে। এবার কাঠোর বাস্তবতায় মুখ ফিরিয়ে আমরা দেখে নিতে পারি ন্যাটো এবং তার প্রতিপক্ষে ওয়ারশ জোটের আবির্ভাব বিশ্ব বাস্তবতায়, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমে কি করে জড়িয়ে পড়েছিল। জার্মানী এবং জাপানকে প্রথমেই দৃষ্টান্ত হিসাবে টেনে আনা যায়। জার্মানীর পূর্বাংশে আবির্ভূত হয়েছিল জিডি আর বা জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক হিসাবে। এখানে নিয়োজিতি ছিল সোভিয়েত রেড আর্মি। আর পশ্চিমাংশ পরিচিত ছিল, এবং এখনও আছে, এফজি আর বা ফেডারেল মার্কিন, ফরাসী এবং ব্রিটিশ জঙ্গি সৈন্য। বিভিন্ন জোনে ভাগ করে এরা নিয়োজিত হয়েছিল। মূলত পশ্চিম জার্মানীতে ন্যাটো এবং পূর্ব জার্মানীতে ওয়ারশ জোট নিরাপত্তা ঘাঁটি গেড়েছিল। যুদ্ধে পরাজিত শক্তি হওয়া জার্মানীর সৈন্য সংরক্ষনের কোন অধিকার ছিল না। এখনও অর্থে নেই। কথা ছিল পূর্ব জার্মানীতে ওয়ারশ জোটের সৈন্যসমাবেশ বন্ধ হলে পশ্চিম জার্মানী থেকে ন্যাটো সৈন্য সরে যাবে। কিন্তু ওয়ারশ জোটে বিলুপ্তি ঘটলেও ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে ওয়ারশ জোটের সৈন্য সমাবেশ বন্ধ হলে পশ্চিম জার্মানী থেকে ন্যাটো সৈন্য সরে যাবে। কিন্তু ওয়ারশ জোটে বিলুপ্তি ঘটলেও ঐক্যবদ্ধ জার্মানীতে ন্যাটো সৈন্যের উপস্থিতি হ্রাস পায়নি। মিত্র শক্তির ভাগ করা নীতির রেশ এখনও টিকে আছে বহাল তবিয়তে। জাপানের ক্ষেত্রে অবশ্য দুই জোটে যৌথ বা আলাদা আলাদা উপস্থিতি দেখা যায় না। এখানে মার্কিন আধিপত্য লক্ষ করার মত। জাপানে এখনও মার্কিন সামরিক ঘাটি রয়েছে এবং জাপানের সামরিক কার্যক্রমের উপর

এখনও, ঠান্ডাযুদ্ধের অবসানের পরও, জাতিসংঘ বা জাতিসংঘের নামের আড়ালে মার্কিন খবরদারী কার্যকর রয়েছে। ন্যাটো বিরোধের আরো অনেক ঘটনা উল্লেখ করা যায়। মিশরে ইসরাইল বিরোধ আরব-ইহুদী বিরোধ, লিখিয়া-মার্কিন-ইসরায়েল বিরোধ, লেবানন সংকট, ১৯৬১ সালে কিউবা সংকট, ১৯৫০ - ৫৩' তে সারে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েত নাম -ফ্রান্স বিরোধ আফগানিস্থান সংকট এ সকল কিছুইশেষ পর্যন্ত ন্যাটো-ওয়ারশ বিরোধে পরিণত হয়েছিল। বরং আরো কষ্টে করে বললে মার্কিন-সোভিয়েত বিরোধের লামান্তরও এ সকল ঘটনা। এ-সমস্ত ঘটনাবলী মধ্যদিয়েই ঠান্ডাযুদ্ধের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়েছে, কখনও নরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দু'জোটের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন দিয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে, মার্কিনরা পাকিস্থানীদের সহায়তা পাঠিয়ে ছিল সপ্তম নৌবহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরবর্তীকালে গোটা বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়েছিল দুই শিবিরে। মার্কিন শিবির, যার নিরাপত্তা জোট ন্যাটো এবং সোভিয়েত শিবির, যার নিরাপত্তা জোট -ওয়ারশ প্যাক্ট। ৬ -এর দশকে অবশ্য অন্যধরণের জোট বাঁধার প্রয়াসও লক্ষণীয় যার দরুণ জন্ম নিয়েছে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। তথাপি চুড়ান্ত -উত্তেজনার মূহুর্তে ন্যাটো আর ওয়ারশ'র কার্যক্রমই কাঁপিয়েছে বিশ্ব। এসব ফেলেছে মানুষের মগজে যার জন্য জোট দু'টোর রেশারেশির অন্য নাম মনস্তাত্তিক যুদ্ধ বা Psychological War, অন্যকথায় ঠান্ডাযুদ্ধ। ১৯৯১ সালের ঘটনাবলীর পর আমরা বলতে শুরু করেছি ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। কিন্তু হয়েছে কি? -প্রকৃতই?

১৯৯১ সালের ঘটনাবলীর পর আমরা বলতে শুরু করেছি ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। কিন্তু হয়েছে কি? -প্রকৃতই?

০.৪

আর এ সমস্ত ঘটনার প্রভাব পড়েছিল গোটা বিশ্বে। জাতীয় মুক্তির আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে দেশে। সারা আফ্রিকা মহাদেশ জেগে উঠেছিল মুক্তির আকাঙ্খায়। পাঁচ এবং ছয়ের দশকে একে একে স্বাধীন হতে শুরু করল ইরাক, আলজেরিয়া, মিশর, কঙ্গো। একে একে স্বাধীন হচ্ছিল ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের উপনিবেশ গুলো, এদিকে ভিয়েতনাম, এবং ইন্দোচীনের দেশ গুলো জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে সফলকাম। লাতেন আমেরিকায় দেখা দিল মার্কিন বিরোধী আন্দোলন, গেরিলাযুদ্ধ, মার্কিন অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ ওয়ারশ জোট আর বিপক্ষে ন্যাটো মার্কিন নেতৃত্বে। উদ্দেশ্য যাই হোক সে সময়ে সোভিয়েত ভূমিকা মুক্তিকামী তৃতীয় বিশ্বের মানুষের পক্ষে গিয়েছিল। আমাদের বাংলাদেশ সেই সব ঘটনার দৃষ্টান্ত। গোটা পাঁচ, ছয় এবং সাতের দশকে ন্যাটো তৃতীয় বিশ্বে স্বাধীনতাকামী শক্তির

কাছে। উপনিবেশ বিরোধী শক্তির কাছে প্রতিক্রিয়শীলতার প্রতিভু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নয়া বিশ্বে, নয়া বাস্তবতায় সেই রোমহর্ষক ঘটনাপঞ্জী চোখে পড়ে না, পড়ে না বলেই ন্যাটোর সুর পাল্টানো গান শোনা যায়, নতুন মোড়কে। যদিও এর অস্তিত্বের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন থাকে যে কোন যুদ্ধ জোটের ক্ষেত্রেই।

০.৫

যে বিশ্ব বাস্তবতা আমরা পেয়েছি - ১৯৯১ সালে কালান্তরী ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে এবং ন্যাটোর সম্প্রসারণ পথ যে ভাবে রচিত হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে ন্যাটো এবং বিশ্ব বাস্তবতাকে উপাস্থাপন করা যায় এভাবে -এই কাল্পনিক চিত্রে ন্যাটোর নয়া বিস্তার এবং মার্কিন প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো ন্যাটোর টিকে থাকার প্রয়োজনীয়তা কি?

আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি। সৃষ্টিকালে যে সমস্ত যৌক্তিক এবং বাস্তব ভিত্তির প্রেক্ষিতে ন্যাটো গঠিত হয়েছিল তার কোনটাই এই পরিবর্তিত বিশ্বে কার্যকর কি? কার্যকর নয় একথা বোঝা যায়। তবুও ন্যাটো টিকে আছে। সম্প্রসারিত হচ্ছে তাহলে যুক্তিটা কোথায়? কমিউনিজমের ভুততো তাড়িত করছেন না ইউরোপকে, এমন কি উপনিবেশবাদ বিরোধী আদোলনের প্রয়োজনীয়তাও এখন প্রায় তিরোহিত, কেন না উপনিবেশের সংখ্যা বর্তমানে একেবারেই নগন্য। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গেঁ যাওয়ার পর সকলেই ভেবেছিলেন ন্যাটোর অস্তিত্বের সপক্ষে আর কোনো যুক্তি থাকে না। কিন্তু ন্যাটোর কার্যক্রম পুরোদমে চলছে এবং এর সম্প্রসারণ ও ঘটেছে। পোল্যান্ড, হাঙ্গাঁরী চেক প্রজাতন্ত্র ন্যাটোর নতুন মুখ। যদিও রাশিয়ার এব্যাপারে প্রবল আপত্তি রয়েছে। নয়া মেরুকৃত বিশ্বে ন্যাটোর অস্তিত্ব হয় তবা একারণেই যে এখনও ন্যাটোভুক্ত দেশ গুলো 'করো' কাছ থেকে হুমকি আসবে বলে বিবেচনা করছে এবং বিশ্বে ন্যাটোর আড়ালে থেকে মার্কিন কর্তৃত্ব বহাল রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে। ঠান্ডাযুদ্ধকালে ন্যাটোর বিশ্বশক্তির ভারসাম্যের জন্যে প্রয়োজন ছিলো। এ যুক্তি তখন হয়ত বা গ্রহণযোগ্য ছিল কিন্তু এখন কেন?

এ ব্যাপারে Edward A. Kolod এবং JOHN W.R. LEPINGWLL-এর মন্তব্য যেতে পারে, NATO IS STILL A STRATEGIC HEDGE AGAINST THE RESURGENCE OF AN A OLD - GUARD COMMUNIST OR VIRVLENTLY NATIONALISTIC REGIME/N RUSSIA THAT MIGHT JINGOIST, EXPANSIONIST. PREOPATORY AT HOEM AND ABROAD, AND OPPOSED TO OPEX MARKETS AND PRIVATE PROPERTY. NATO IS CLEARLY AN INDISPENSABLE PART OF ANY WORKABLE MIX OF SOLUTIONS FOR EUROPE'S POST -COLD WAR SECURITY SYSTEM.
(CONTEMPORARY SECURITY POLICY, VOL 18, NO. 1. APRIL 1997).

এবক্তব্য থেকে পরিস্কার হয় বর্তমানের ন্যাটো দর্শন। এখনও পূর্বের ভীতি কার্যকর রয়েছে ন্যাটো সদস্যদের মধ্যে। বিশ্বে কর্তৃত্বের প্রশ্নে জাতিসংঘকে যতটুকু কাজে লাগানো যায় - ক্ষেত্র বিশেষে ন্যাটো তারচে' বেশী প্রয়োজনীয়। মার্কিনী অভিলাষ জাতিসংঘের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হলেও প্রায়শই সদস্য রাষ্ট্রের আশ্রয়, যেখানে ছাতার ভাঁটাটি- থাকবে মার্কিন কর্তৃত্বে তার প্রয়োজনই খুব বেশী নয় বিশ্বে নয়া রুপে -ন্যাটো সেই ছাতার ভূমিকায় আবিভূর্ত।

মুকাভিনেতা পার্থ প্রতিম মজুমদার ঃ

পদ্মা পাড়ের চোখে পৃথিবী দেখেন যিনি

পার্থের বাবা ছিলেন প্রেস ফটোগ্রাফার। বাবার নিজস্ব স্টুডিও ছিলো পাবনায়। যদিও ওর দেশের বাড়ি ফরিদপুরের পাংশাতে। বাবার কারণে চলে আসতে হয়েছিলো পদ্মার পাড়ে, পাবনায়। পার্থ যখন ছোট ছিলো, পাবনায় তখন প্রচুর উৎসব হতো, তা হিন্দুদের পালা পার্বনই হোক অথবা মুসলমানদের মহরমই হোক না কেন বিভিন্ন উৎসবে অনেক অনেক অনুষ্ঠান হতো। পার্থ কিন্তু কোনটাই বাদ দিতো না। বিশেষ করে গ্রাম থিয়েটার আর সংখেলা গুলো দেখে এসেই দুরন্ত পার্থ মায়ের শাড়ি খানা খাটের সাথে পেচিয়ে নিজেই তৈরী করে নিতো মঞ্চ। তারপর চলতো অঙ্গভঙ্গি, পুরোপুরি না মিললেও, বেশ মিলে যেতো তার দেখার সাথে। চাই বোন এটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করতো। কিন্তু পার্থ সিরিয়াস। এই সিরিয়াসনেসের কারণেই সেই দুরন্ত ছেলেটি মুকাভিনয়ের শুরু। আজকের পার্থ প্রতিম মজুমদার। তখনও পার্থ চার্লি চ্যাপলিনের ছবিও দেখেননি। লোক হাসানোর জন্যই অজান্তে মাইমের দুয়ারে পা দিয়েছিলেন পার্থ প্রতিম। কলকাতার কাছে চন্দননগরে তিনি যখন পড়াশুনা করতে যান তখনই পরিচয় খোগেন দত্ত, ওরফে যোগেন মাইমের সাথে। এর পর দেশ স্বাধীন হলো। পার্থ ভর্তি হলেন মিউজিক কলেজে। সেই সময় গান গাইয়ে ছেলে হিসেবে সবেমাত্র পরিচিতি পেতে শুরু করেছিলেন কলেজ গন্ডিতেই। কিন্তু একদিন এর মনে অনুশীলন করতে গিয়ে ধরা পড়লেন ইংরেজী শিক্ষক আহ্সান হাবীবের কাছে। তিনিই কথা বার্তা বলে সুযোগ করে দিলেন শিক্ষাঙ্গন নামে একটি অনুষ্ঠানে পার্থকে। এভাবেই টিভি দিয়ে শুরু করে ছিলেন পার্থ। রংধনু, আপন প্রিয়, বলা বাহুল্য। পর পর কয়েকটি অনুষ্ঠান করে মাত করে দিলেন। 'যদি কিছু মনে না করেন' অনুষ্ঠানেও পাথ্য অভিনয় করলেন। এর পরই হয়ে উঠলো মুকাভিনয় তার নেশা। গানকে করে নিলেন শুধু মাত্র নিজের জন্য।

তবে প্রদীপের সলতে পাকানোর মতো পার্থ প্রতিমের শুরুরও একটা অনন্য সূত্রপাত আছে। ১৯৭৪ সালে পুরনো ঢাকার লালকুঠিতে পার্থের প্রথম ষ্টেজ শো হয়।

ঢাকায় পার্থ চিন্তা করছেন দুঃস্বপ্নের, মতো আরেকটি বড়ো প্রকল্প তৈরী করবেন।

পরবর্তীতে শিল্পকলা একাডেমী ও আঁলিয়েস ফ্রাঁসিস তাঁকে দিয়ে শো করায়। পার্থের সবগুলো শোই ছিলো দর্শক মাত করা। একন আর বলার অপেক্ষা রাখে না মুকাভিনয়ই হচ্ছে পার্থ প্রতিম মজুমদারের নেশা, পেশা, ভালোবাসা।

সত্তুরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই মুকাভিনয় একটি স্বতন্ত্র পারফর্মিং আর্ট হয়ে উঠল মূলতঃ পাথ্য প্রতিম মজুমদারকে কেন্দ্র করে। এখন ঢাকায় পার্থ চিন্তা করছেন দুঃস্বপ্নের, মতো আরেকটি বড়ো প্রকল্প তৈরী করবেন। ফ্রান্সে তিনি দুটো মাইমের স্কুল চালান। এবং ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মানের স্কুল চালু করা পার্থের একটি স্বপ্ন। এই স্বপ্ন পূরণে তিনি আশা করেন সরকার অবশ্যই হাত বাড়াবেন।

পদ্মাপারের ভানুই আসলে আজও পার্থ প্রতিমকে তাড়া করে ফেরে। সেই কাদামাখানো শরীর নিয়ে আজকের অবস্থানে উঠে এসে পার্থ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেন। কিংবদন্তিপ্রতীম মুকাভিনেতা মার্শেল মাসি-উ, যিনি মডার্ন মাইমের জন্মদাতা, তাঁর সাথে পার্থ, বিশ্বজুড়ে শো করে বেড়াচ্ছে এটিও তাঁর গর্বের আরেকটি বিষয়।

হতে চলা কিংবদন্তী, বাংলার ছেলে পার্থ প্রতিম মজুমদার আজ শো করে বেড়াচেছন বিশ্বজুড়ে। বিষয় পার্থ প্রতিমের চোখে দেখা পৃথিবীর নির্যাস। যদিও রাজনৈতিক কারণে পার্থ প্রতিম আজ দেশ থেকে অনেক দূরে থাকেন। তবু আজও পার্থ প্রতিম মনে প্রাণে স্বদেশী। পদ্মাপারের ভানুর চোখ দিয়েই আজও পৃথিবীকে দেখেন তিনি। তুলে ধরেন স্বদেশকে।

■ *আশ্রাফ আবির*

হুমায়ূন আহমেদ

এক টুকরো সাক্ষাৎকার

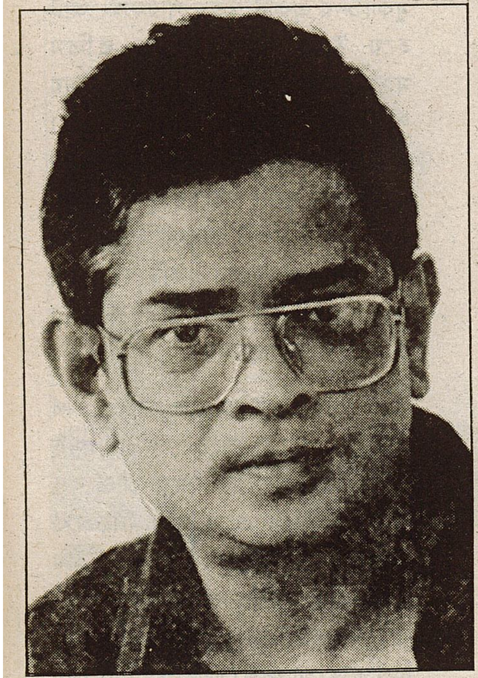

১. আপনার লেখার উদ্দেশ্য কি ?

—কোন উদ্দেশ্য নেই। আঙ্গুলের ব্যায়াম হয় বলেই লিখি।

২. শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই কেন আপনি তুলে ধরেন? অনেকের মন্তব্য ঃ আপনার লেখায় বাস্তবতার ছোঁয়া কম -কেন ?

—আচ্ছা এখন থেকে মধ্য বিত্ত শ্রেণীকে তুলে না ধরে নামিয়ে ধরব। আমি অবাস্তব টাইপ মানুষ বলে।

৩. আপনার অনবদ্য সৃষ্টি 'হিমু'র এমন উদ্ভট আচরণের কারণ কী?

—হিমু অনবদ্য বলেই উদ্ভট।

৪. অনেকে বলেন - হিমু, মিসির আলি, হুমায়ুন আহ্‌মেদ একই চরিত্র। আপনার মন্তব্য কি?

—কোন মন্তব্য নেই।

৫. শিশুতোষ চলচ্চিত্র বনাবার কোন পরিল্পনা আছে কি ?

—না।

৬. আপনার ইতিহাস ভিত্তিক কোন লেখা নেই কেন? ওপার বাংলায় তো এমন প্রচুর লেখা দেখা যায়। আমাদের এখানে এত কম কেন ?

—লেখি নি বলে লেখা নেই। ওপার বাংলায় থাকলেই এপার বাংলায় থাকতে হবে কেন?

■ *মনন প্রতিবেদক*

কোন উদ্দেশ্য নেই। আঙ্গুলের ব্যায়াম হয় বলেই লিখি। ❑

পার্থ বড়ুয়া

নিজের কথা গানের কথা

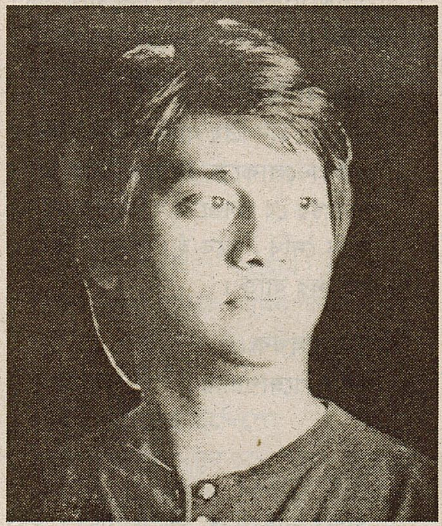

সোলসের পার্থ। চট্টগ্রামের ছেলে পার্থ বড়ুয়া। ব্যান্ড প্রিয় প্রিয় তরুণদের মুখে মুখে ফেরা 'কেন এই নিঃসঙ্গতা'... মনে এলেই যার ছবি ভেসে ওঠে। সেই পার্থ বলেছেন তাঁর নিজের কথা। গানের কথা।

কৈশোর ও সঙ্গীত

আসলে গানটা আমার কিশোর জীবনের শখ ছিল। ছোটকাল থেকেই গান শিখতাম। আমার এক মামা পাকিস্তান টিভিতে গান করতেন। উনার হারমোনিয়ামটা আমি পেয়েছিলাম। তারপর মেট্রিক পর্যন্ত গান শেখে আর গান শেখা হয়ে ওঠেনি।

গীটারের সাথে পরিচয়

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি, তখন গীটার শেখার কুব ইচ্ছে হল। আমাদের পাশের বাসার একটা ছেলে চমৎকার গীটার বাজাত। ওকে দেখেই শিখতে চাইতাম। আর সেই গীটার শেখা হয়ে উঠলো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর। পরে বাচ্চু ভাইয়ের কাছেও গীটার শিখেছি।

মেসেজ

আমাদের ব্যান্ডের নাম ছিল মেসেজ। আমি গীটার বাজাতাম। '৮৮ তে আমাদের একটি এ্যালবাম বের হয় মেসেজ নামেই। তেমন জনপ্রিয়তা পায় নি। পরে সোলসে কী বোর্ডিষ্ট হিসেবে প্রবেশ করি। আর আমি কিন্তু Professionaly কী বোর্ড বাজাই। আর এটা ঠিক যে আমি সোলস-এ প্রবেশ না করে মেসেজকেও এগিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু ঠিক সেই সময়ের জন্য সোলসই ছিল Better Opportunity.

নিঃসঙ্গতা

হ্যাঁ, এই গানটিই আমার সব থেকে জনপ্রিয় গান। আসলে একটা ক্যাসেটে একটা দুটির বেশী গান জনপ্রিয় হয় না। একটাই যায়, তার পেছনে আরো কয়েকটা হয় তো যায়।

হার্ড রক মিউজিক

আমি Rock music পছন্দ করি। কিন্তু Hard Rock সোলস পছন্দ করে না। আমি মাঝে মধ্যে চেষ্টা করেছিলাম। আসলে সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না। আর একথাটা বুঝতে

হবে যে, বাংলা গান কিন্তু Hard Rock হবে না। আমরা ভাত খাইয়া কখনই Hard Rock করতে পারবো না। একজন আমেরিকানের যেমন বাংলা গাওয়া অসম্ভব সেরকম একজন বাঙালীর আমেরিকান গান করা সম্ভব না।

স্মরণীয় ও সেরা কনসার্ট
কলাকাতায় আমরা একটা কনসার্ট করেছিলাম। ওটাই আমি অনেকদিন মনে রাখবো। আর একবার বিশ্বজিতের প্রোগ্রাম করতে গিয়েছিলাম ডোমার নামক জায়গায়। জায়গাটি হয়তো অনেকেই চিনবে না। নীলফামারী জেলা হতে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে। গাড়ি ঘোড়া কিছুই চলে না। আমরা প্রায় দুঘন্টা প্রোগ্রাম করেছিলাম।

এ্যাড বা-মডেলিং
আফজাল হোসেন আমার প্রিয় শিল্পী। এখন তাকে তেমন দেখা যায় না। যাই হোক ওনার সহযোগীতায় আমি ক্লোজ-আপের এ্যাডে মডেলিং করি। আর হয়তো করবো না।

পেশা
পেশা হিসেবে গানকেই বেছে নিয়েছি।

তিক্ত অভিজ্ঞতা
অনেক, অনেক। একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপেন এয়ার কনসার্টে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমি সিরিয়াস, মানে ডাইরিয়ার চূড়ান্ত অবস্থা। ওই অবস্থায় কনসার্টে গিয়েছি। এক কাপ চাও খাইনি। যেকোন অবস্থায় পড়ে যেতে পারতাম। তাও ১২-১৪টা গান গেয়েছি।

খেলাধূলা
ক্রিকেট আমি ভালবেসেছিলাম। তবে আমি মনে করি আমাদের দেশে ফুটবল খেলা উচিৎ না। আমার ভালো লাগে শ্রীলঙ্কা দলকে এবং এই দলে ব্যাটসম্যান অরবিন্দ ডি সিলভাকে।

প্রিয় ব্যক্তিত্ব
আমার কোন প্রিয় ব্যক্তিত্ব নেই। কারণ একটা লোককে প্রিয় ভাবতে হলে সচরাচর যে গুণগুলো থাকা দরকার তা আমি দেখি। তবে হ্যাঁ হিটলার আমার পছন্দের ব্যক্তি।

প্রিয় লেখক
সুনীল গঙ্গোপধ্যায়।

প্রিয় খাবার
খাবার প্রায় সবই ভালো লাগে। তবে অবশ্যই বাঙালী খাবার। আর ভাতের উপরে কোন খাবার নেই।

প্রিয় ব্যন্ড
রেনেসাঁ। রেনেসাঁর সব গানই আমাদের গ্রহণ করা উচিৎ।

প্রিয় চলচ্চিত্র অভিনেতা
রাজ্জাককে একসময় খুবই ভালো লাগতো। দেশের বাইরে অনেককেই ভালো লাগে।

প্রিয় নেতা
শেখ মুজিবুর রহমান। নেতা হিসেবে বিশ্বে অন্যতম আর এর চেয়ে বড় নেতা

বাংলাদেশে হয়নি আর হওয়ার সম্ভাবনাও দেখছি না।

প্রিয় পত্রিকা ও দৈনিক
বিচিত্রা, ভোরের কাগজ ও রহস্য পত্রিকা।

প্রিয় শিল্পী
আফজাল হোসেন। এমনিতে সূবর্ণা মোস্তফা আমার all time favourite.

অবসর
বই পড়ি, ঘুমাই কিন্তু গান শুনি না।

পড়াশুনা
এখন করি না। আগে করতাম। বিশ্রী লাগে। গল্পের বইও পড়তাম। এখন পড়ি না। এখন আমার শখ হল Air Craft সম্পর্কে পড়াশুনা।

ব্যন্ড শিল্পীদের উদ্দেশ্যে
বর্তমান ব্যান্ডের গান শুনে তেমন কিছু হবে না। Basic তৈরী করতে হলে ভালো গান শুনতে হবে। ভালো বাংলা গান শুনতে হবে। শুধু সোলস থেকে যদি আরো ভালো গান না বের করতে পারি তবে সোলস টিকবে কিনা সন্দেহ আছে। মান্না দে, সচীনদেব বর্মন ও আমাদের দেশের সুবীর নন্দীকে follow করতে হবে। আর গান গাইতে হলেই যে গাঁজা মদ খেতে হবে এমন কোন কথা নেই।

স্বপ্ন
আমাদের গানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এটা যার মাধ্যমেই হোক, আমার স্বপ্ন পূরণ হবে। যদিও আগামী দশ বছরের মধ্যে কোন নিশ্চয়তা দেখি না।

আক্ষেপ
একটা সময় ছিল যখন পড়াশুনা করতে চাইতাম না। কিন্তু এখন বুঝি পড়াশুনাটা কত দরকার ছিল। আর যাই করুক না কেন একাডেমীক কেরিয়ার ঠিক রাখা উচিত। এখন যদি আমি ফেরৎ যেতে পারতাম তবে গানবাজনা নয় পড়াশুনাই করতাম। আর next জন্মে ঠিক করেছি মিউজিসিয়ান হবো। তবে Academic carear ঠিক রেখে।

■ *মনন প্রতিবেদক*

তুমি যদি কাউকে মাছ খাওয়াও তাহলে তাকে একদিনের জন্যেই খাওয়ালে। আর যদি তাকে মাছ ধরার পদ্ধতিটি শিখিয়ে দাও তাহলে তার সারা জীবনের মাছ খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে।

চীনা প্রবাদ

শামসুর রাহমান

স্খলনের পরে

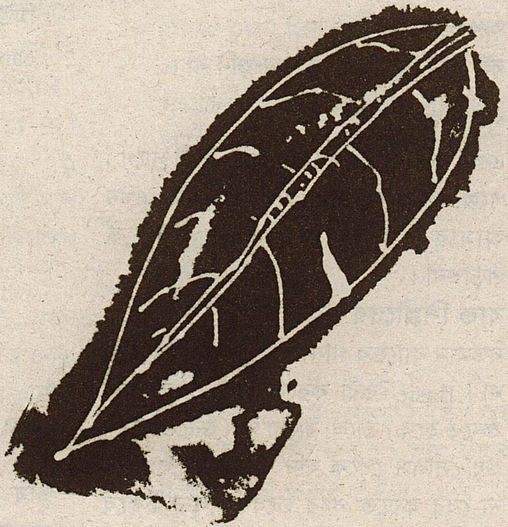

লুকিয়ে বেড়াই সারা দিনরাত,
যেন আমি এক পলাতক জীব।
আমার পেছনে শিকারী কুকুর,
দন্ত নখর, লকলকে জিভ।

ভয়ে ভয়ে থাকি সর্বদা আজ,
সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ছুটছি।
খাচ্ছি হোঁচট, পড়ছি গর্তে,
কাদামাটি ঝেড়ে আবার উঠছি।

নিজেকে করেছি ক্লিন্ন ভীষণ,
হচ্ছি সবার ঘৃণার শিকার ;
বান্ধব যারা তারাও বিরূপ,
কিছুতেই আর নেই নিস্তার।

আমাকে চড়িয়ে ক্রুশকাঠে ওরা
পেরেক ঠুকবে সারাটা শরীরে।
ঝরবে রক্ত কাঁকরে ধুলোয়,
রইব বন্দী মন্দের ভিড়ে।

মা আমার মৃতা, তবু তাঁর চোখ
আমার সঙ্গে রোজ কথা বলে।
একদা যে-চোখ ছিল সুকোমল,
আজ তা' প্রখর, খাঁ খাঁ রোষানলে !

তাকাতে পারি না সে চোখের দিকে,
আমার স্খলনে রুষ্ট কি তিনি ?
তবু মনে হয়, আমার মাথায়
রেখেছেন হাত গর্ভধারিনী।

যে যাই বুঝুক, যে যাই বলুক,
জানি, মা আমার আমাকে চেনেন
সবচেয়ে বেশি। আমার সঙ্গে
ছিল না তো তাঁর কোনও লেন দেন।

আবু হাসান শাহ্‌রিয়ার

ভ্রমণ নির্দেষিকা

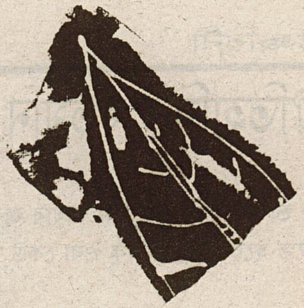

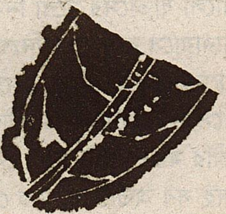

যার হাতে মালমাত্তা, তারই বেশি হ্যাঁপা
ভ্রমণে কি গুচ্ছের জঞ্জাল
সঙ্গে নিতে আছে ?
পার তো উদ্বাস্তু হয়ে এসো
যাকে বলে শূন্য হাতে থাকা চাই
মনে কি পড়ে না সেই করতালি, শিশুকালে তুমিও দিয়েছ ?
সভ্যতাতে তুড়ি মেরে না -যদি ওড়াও
অনন্ত শৈশব তুমি কখনও পাবে না।
তুমিও কি মারা যাও, হাতে যদি মালমাত্তা থাকে?

সমুদ্র গুপ্ত

ভবঘুরে দিন

রাজপথে অলিতে গলিতে
উত্তরে দক্ষিণে পূবে পশ্চিমে এপাশে ওপাশে
দিন যায় যেতে থাকে
অবসর ক্লান্ত ফুটপাতে বৃক্ষচ্ছায়
কখনো বিশ্রাম নেয়
বিশ্রামের জন্য নয়, কেবলই যাওয়ার
অবিরাম অনি:শেষ পথের মতো
দিন যায় যেতে থাকে ভবঘুরে দিন
বৃষ্টি এসে ধুয়ে দেয় হাওয়ার মলিন
নতুন সার্টের মতো রৌদ্র গায়ে
দিন যায় ভবঘুরে দিন।

উজ্জয়িনী

ঐতিহাসিক বর্তমান

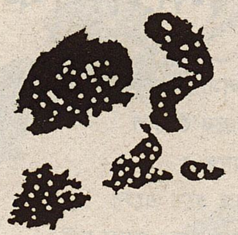

যে ভাষায় কথা বলি, সে ভাষার জন্য
দিতে হবে প্রাণ, তা কি ওরা কেউ জানতো ?

আলো বাতাসের মধ্যে নিত্য বসবাস,
আনায়াসে বয়ে যেত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস !
গ্রামের নিভৃতি ছেড়ে, ছেড়ে প্রিয়জন,
এসেছিল মেটাতে তো জীবনের কিছু প্রয়োজন।
বর্গীর মতন কেউ, হানা দেবে, ভাবতো ?
সেই সব অতীতের বুকে লেখা কাহিনী-
মোছেনি যে একেবারে, তা তো ওরা বোঝেনি।
অতর্কিতে নেমে আসা প্রমাদের উত্তাপ,
কেড়ে নিতে চেয়েছিল অস্তিত্বের অধিকার।
ওরা নেমেছিল পথে সকলের জন্য
ওরা ছিল নির্ভীক, দুরন্ত, বন্য !
দেশের মানুষ কেন বঞ্চিত, শোষিত
এই সব ভেবে ভেবে হতো ওরা ব্যথিত।
জমানো যাতনা তাই ঝরে ঝরে পড়লো
রাজপথে রক্তের বর্ষণ নামলো!
বেদনার নীলরঙ জমে আছে আকাশে,
ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস আজো ভাসে বাতাসে।
ওদের ভুলিনি কেউ, কি করে বা ভোলা যায় ?
ওরা যে জড়িয়ে আছে আমাদের সত্বায়।
ওদের স্বপ্ন যদি হয়ে ওঠে বাস্তব
তবেই না অনুষ্ঠান আয়োজন সার্থক।
শহীদ-মিনারে যাওয়া, খালি পায়ে সদলে
সোচ্চারে গান গাওয়া, একসুরে সকলে,

এ সবের অর্থ কি, কেন এত আয়োজন
এখনো কি জানাবার নেই কোন প্রয়োজন।
নইলে কি করে এরা অতীতকে জানিবে?
কেনই বা গালভারা উপদেশ মানবে?
জাগ্রত চিত্তের তরুণ, কিশোর প্রান
এখন তাদেরই হাতে এদেরশের সম্মান।
এদের হৃদয়ে জমা প্রশ্নের উত্তর
দিতে হবে আমাদের, অতিদ্রুত, সত্বর।

মীর মাসরুর জামান

সূচিপত্র

(রত্না. প্রিয় বোন. বন্ধু. বৌদিকে)

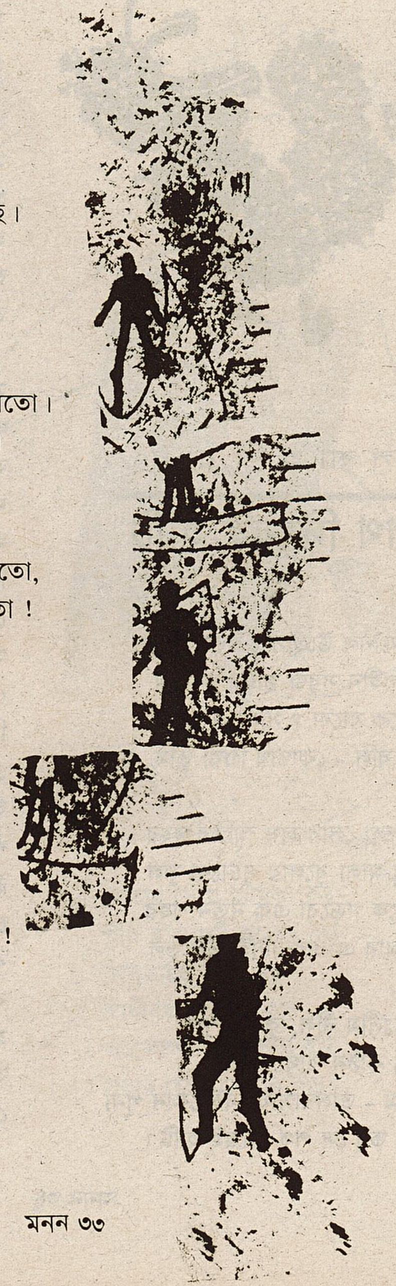

আমার একটা পৃথিবীর মতো মা আছে।
না। আমার মা
পৃথিবীর মাটির মতো
আলোর মতো
কিংবা জল
অথবা হাওয়ার মতো।
না। আমার মা ঠিক পৃথিবীর মতোই।

স্মৃতির মতো আমার বাবা আছে।
স্মৃতি হচ্ছে একজোড়া চশমার মতো,
একজোড়া চশমা ঠিক ভালোবাসার মতো,
আর ভালোবাসা অবিকল যন্ত্রণার মতো !

আমার একটা বৌদি আছে
বাংলাদেশের মতো
এই যেমন,
বৃষ্টি পড়তে পড়তে রোদ
আবার রোদের মধ্যেই বৃষ্টি !

কষ্টের মতো কিছু ভালোলাগা আছে
আবার সুখ নামের কিছু দুঃসহ যন্ত্রণা !

আমার একটা 'তুমি' আছে
'তুমি'টা ঠিক তোমার মতো
অথচ
যে তুমি দৃশ্যমান,
সে-কি সত্যি আমার আছো ?

মু কু ল শা হ রি য়া র

যে পথ দিয়েই হাঁটি

সম্মুখে ফেনিল উচ্ছাস ঃ উত্তাল সমুদ্র
পশ্চাতে গহীন সবুজ স্থবির বনভূমি
কোন দিকে যাবো ? সাহসও ক্ষুদ্র
চিৎকারে বলি - কোথায় প্রিয়া তুমি

ডানেতে ভগ্ন লোকালয় স্মৃতির বহর
বায়ে ছিন্ন মালা ধূলোয় লুটানো ফুল
প্রিয়ার বুকে গড়বো এক নতুন শহর
বুঝি, আমার এ ধারনাটাই ছিল ভুল

উপরে নিঃসীম নীল, ঝুলন্ত শূন্য
নিচে স্তব্ধ কঠিন পাথুরে মাটি
জানি প্রেম - ভালবাসায় নেই কোন পূন্য
ভুল করে তবু সে পথ দিয়েই হাঁটি।

আনিসুর রহমান রানা

বন্ধুকে

জানি একদিন আমি মরে যাব
সকল ভালবাসা অথবা ঘৃণার হাত গলে
সময়ের কচি কলাপাতা রঙের ঘর জীর্ণ
হবে একদিন
জালের ভেতর জমে ওঠা শ্যাওলার সবুজ
ভারী হয়ে আসবে ক্রমেই ....

সকালের সোনালী বেড়ালছানার মতো
আদুরে নরম রোদ হয়তো ছোবেনা
আমাকে
দুপায়ের তপ্ত আঙ্গিনায় গলিত পৃথিবীর
মানচিত্রে
বিস্মৃত হবে আমার নাম
কোকিল ডাকা গোধূলী সায়াহ্নের
অলস সময়ে আবীর রাঙা হাসিতে
যে ছিল একদা স্বপ্নচারিনী
বিস্মৃত মনে ভাববে
কেউ কি ছিল একদিন ?
আর তুমি, প্রিয় বন্ধু আমার
শীতের পাতা ঝরা রিক্ত নিশীথ
উপত্যকায়
চলেছি কতনা পথ দুজনে
কাধে কাধ মিলিয়ে
কান্নাকে গান করে শান্ত করেছি বিপরীত
হৃদয়
অসূয়া ভুলে অসাবধানে সেদিনও কি
তেমনি করে মনে পড়বে আমায় ?

লুৎফর রহমান রিটন

দুটি ছড়া

এক.
হরেক রকম নেতা আছেন
সবুজ হলুদ লাল
সকল নেতাই পারদর্শী
করিতে হরতাল।

কোনো নেতা বামপন্থী
কোনো নেতা নামপন্থী
কেউবা আবার ডানপন্থী
চা সিগারেট পানপন্থী
দেশপন্থী নয় কেউ নয়
হায়রে কলির কাল
সকল নেতাই পারদর্শী
করিতে হরতাল।

দুই.
পাওনাদারের লিষ্টি বড়
শ্বশুর বাড়ির ইষ্টি বড়
চিকিৎসকের ফিস্‌টি বড়
মরণচাঁদের মিষ্টি বড়
ঋণখিলাপীর দৃষ্টি বড়
শিল্পী কবির সৃষ্টি বড়
ফজলী নামের আমটি বড়
বুদ্ধিজীবীর নামটি বড়

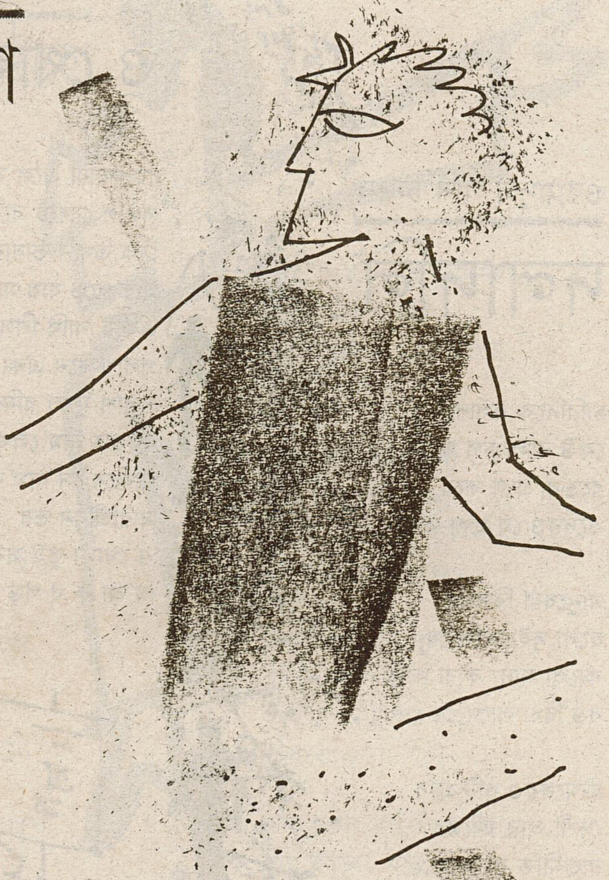

নেতার চেয়ে আমলা বড়
পীর বাবাদের গামলা বড়
কবিতাতে মিষ্টি বড়
স্বাধীনতার হিষ্ট্রি বড়
আন্দোলনের রেশটা বড়
সবার চেয়ে দেশটা বড়।

ওবায়দুল গনি চন্দন

দলাদলি

চারিদিকে দলাদলি
কেউ বলো চুপ থাকে ?
রক্তেরা গ্রুপ করে
ওদেরও যে গ্রুপ থাকে।

মানুষেরা বিভক্ত
হলো দুই ভাগে যে,
কালো সাদা কারা দামী
বড় দ্বিধা লাগে যে।

ডিমদেরও দুটি গ্রুপ
দেশী আর ফার্মের,
রাজনীতি দলাদলি
নেতা পায় চার্ম-এর।

দল নিয়ে হানাহানি
কোন্দল বাড়ছে,
পৃথিবীর সুখ আর
ভালোবাসা কাড়ছে।

সারওয়ার-উল-ইসলাম

ও খোকা তুই

ফেব্রুয়ারী এলে যখন
পলাশ ফোটে বনে
ঠিক তখনি ভাষার কথা
যায় পড়ে যায় মনে।
একটি পাখি শিস দিয়ে যায়
পলাশ বনে একা
পলাশ ফুলে রফিক সালাম
বরকত নাম লেখা।
থাকবে সে নাম বুকের ভেতর
সারাজীবন ভর
ও খোকা তুই সবার আগে
অ আ ক খ পড়।

তুহিন রহমান

বয়স যখন আঠারো

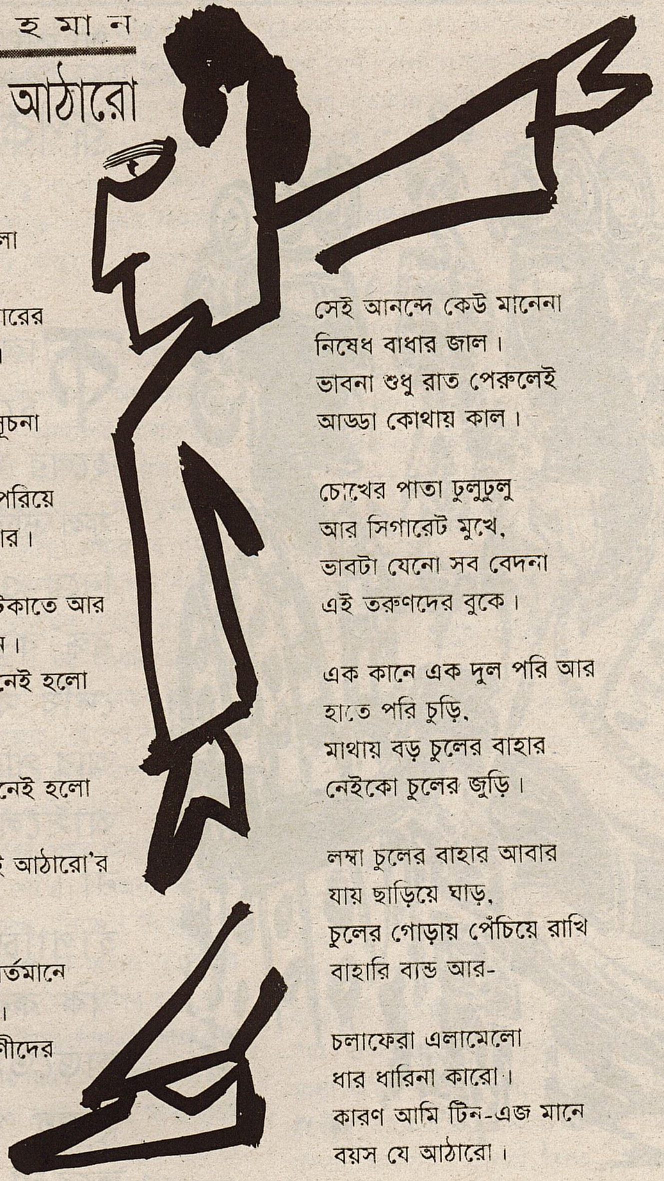

আঠারো মনেই হলো
টগবগে তার চলা
অন্যায় এবং অবিচারের
বিরুদ্ধে তার বলা।

এই সয়সেই হয় সূচনা
আদর্শ পথ ধরার,
লেখাপড়ার পথ পেরিয়ে
নিজের জীবন গড়ার।

পারবেনা পথ আটকাতে আর
ঝড়-তুফানের দিন।
আঠারো বয়স মানেই হলো
ভয়-ভাবনাহীন।

আঠারো বয়স মানেই হলো
করবে শুধু জয়।
কিন্তু আজকে এই আঠারো'র
দেখছি অবক্ষয়।

টিন-এজ মানে বর্তমানে
ভুলে যাওয়া সব।
তরুণ এবং তরুণীদের
আনন্দ উৎসব।

সেই আনন্দে কেউ মানেনা
নিষেধ বাধার জাল।
ভাবনা শুধু রাত পেরুলেই
আড্ডা কোথায় কাল।

চোখের পাতা ঢুলুঢুলু
আর সিগারেট মুখে,
ভাবটা যেনো সব বেদনা
এই তরুণদের বুকে।

এক কানে এক দুল পরি আর
হাতে পরি চুড়ি,
মাথায় বড় চুলের বাহার
নেইকো চুলের জুড়ি।

লম্বা চুলের বাহার আবার
যায় ছাড়িয়ে ঘাড়,
চুলের গোড়ায় পেঁচিয়ে রাখি
বাহারি ব্যান্ড আর-

চলাফেরা এলামেলো
ধার ধারিনা কারো।
কারণ আমি টিন-এজ মানে
বয়স যে আঠারো।

গল্প

আনোয়ারা বেগম

রূপকথার মতো

কালামকে দেখে চটে উঠলো হলের মালী বিলাস। ফুল ভর্তি থলিটা হাতে নিয়ে ও তখন দরজা বন্ধ করছিল- "এত দেরি করলি ক্যান্, আর পাঁচ মিনিট পরে আসলে পাইতিস না।" কালাম হাঁপাচ্ছিল, বলল- "কি করবো, মালিক ছাড়তেই চায় না। হাতে পায়ে ধরে-তবে না।"

দশ টাকার নোট দেখে বিলাস নরম গলায় বলল- "পরে দিস্ বরং, বাড়িতে মা'র অসুখ, বলছিলি না, দুই একটা কমলা নিয়া যা বরং।" কালামের মনে পড়ল, ক'দিন ধরেই মার জ্বর, আজ তো কাছেও যেতে পারেনি, ঘরে খাবার মত কিছু না থাকারই কথা। মোড়ের দোকান থেকে পাউরুটি কিনল, তারপর এক ছুটে বস্তিতে- নিজেদের আস্তানায়।

আর একটু দেরি হলে বিলাসকে পেত না, ফুলও মিলত না, বেশি পয়সায় অন্য কাউকে দিয়ে দিত বিলাস। আসলেই বিলাসভাই মানুষটা বড় ভালো, এবার যা লাভ হবে, অর্ধেকটা সে বিলাসকে দেবে। ঘরে ঢুকতেই সে ভাবনাটা উবে গেল। এবার যে পয়সা পাবে, তা দিয়ে মার জন্য একটা খাট কিনতে হবে। গতবারও ভেবেছিল, পেরে ওঠেনি। "মা, কোথায় তুমি ! ঘর আঁধার কেন ? বাতি জ্বালো নাই ?" আপাদমস্তক কাঁথায় মুড়ে শুয়েছিল হাজেরা, ছেলের গলা শুনে উঠে বসল, "এত দেরি করলি বাপ্। কুপিতে তেল নাই, আনতে পারি নাই।"

কালামের মনে পড়ল, গায়ে জ্বর নিয়েও মা এই ক'দিন কাজে গেছে। ওর জন্য খাবারও গরম করে দিয়েছে, নিজেও কিছু মুখে দিয়েছে। বাঁধা-বাসা না হলেও দু'বেলার খাবার পায় হাজেরা, মা-ছেলের চলে যায় তাতে। তা ছাড়া চায়ের দোকানে কাজ করা কালামের সকালের নাস্তা, দুপুরের খানা তো দোকানেই। রাতে বাড়ি ফিরে মা'র সঙ্গে খায়, হাতে করে এটা ওটা নিয়েও আসে। "তুমি কিছু খাইছ ? নাও পাউরুটিটা ধরো, আমি তেল নিয়া আসি।" মার হাতে হাত ঠেকতেই চমকে ওঠে কালাম, আগুনের ছেঁক লাগে যেন। কপালে হাত দেয় তাড়াতাড়ি- "মাগো, তোমার গা এত গরম ক্যান্ ? জ্বর ছাড়ে নাই ?"- "ও কিছু না। প্যারাসিটামল নিয়া আসিস দুইটা।" কালাম চিন্তিত মুখে তেলের বোতল হাতে নিয়ে বেরুল। এত জ্বর নিয়ে মা মালা গাঁথবে কি করে ? কিছু খায়নি নিশ্চয় সারাদিন। পাশের ঘরের করিমন খালাকে ডাকলে পারত। মা তো জানে রাত এগারোটার মধ্যেই তাকে বেরুতে হবে মালা নিয়ে। একটু আগে না গেলে এত কষ্ট করেও লাভ হবে না। বিশ তারিখের এই রাতটার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকে। গত বছর যে আয় হয়েছিল, তা দিয়ে একটা চাটাই, পুরানো একটা কম্বল আর উলের একটা জামা কিনে দিয়েছিল মা'কে। মহরমের মেলা থেকে একটা চৌকি কেনার ইচ্ছা ছিল। বঙ্গবাজার থেকে নিজের জন্য একটা জিনসের ফুলপ্যান্ট কেনার লোভ বহু কষ্টে সামলেছিল। চায়ের দোকানের অন্য বয় বেয়ারারা কি ছিমছাম থাকে ! কালো-হলুদ ডোরা কাটা গেঞ্জিটা কেনার লোভও সামলেছে সে, মা'র জন্য কিছু করতে তো পারেনি এতদিন। স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে কত বছর ধরে শুয়ে কাটিয়েছে মা, দু'বছর ধরে কাশিটাও বেড়েছে কিন্তু। ঘরে ফিরে কুপি জ্বালালো কালাম, চা বানাল, রুটি সেঁকল। "মা ! ও মা, ওঠো, খাইয়া, বড়ি দুইটা খাও। মালা ক'টা গাইথ্যা দাও, সময় কিন্তু নাই বেশী।" হাজেরা উঠে বসলো, আপাদ মস্তক কাঁথায় জড়ানো। কালাম বলল - "জ্বরটা কমে নাই একটুও ? চোখ এত লাল কেন

মা ?" হাজেরা খেয়ে নেয়। বলে- "তুই খা বাপ্ ! তার আগে ছুঁচ সুতার আর ফুলের গুলা দে। আমার বেশী টাইম লাগব না।"

বড় একটা বেতের ঝুড়িতে ফুলগুলো সাজিয়ে রাখে কালাম, সুঁচ-সুতোর প্লাষ্টিকের কোটা এনে রাখে মা'র বিছানার পাশে। দূরে কোথাও ঘন্টা বেজে ওঠে, রাত ন'টা বাজলো।

হাজেরা সূঁচ সুতো পরাতে যায়, এত অন্ধকার কেনো, চোখ খুলে রাখতেও পারছে না সে। পেটের মধ্যে গুলিয়ে ওঠে। কোনমতে বিছানা ছেড়ে, দরজা পর্যন্ত যাবার আগেই হড় হড় করে বমি করে ফেলে, কাল কাজ থেকে ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজেছে, জ্বর গায়ে ভেজাটা ঠিক হয়নি। ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়েছিল। দোকান থেকে ফিরে কালাম দেখেছিল, মা ঘুমিয়ে। গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিল মা ঘামছে। জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে ভেবে চিন্তামুক্ত মনে, কাপড় বদলে, উনুনের পাশে রাখা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ সকালে হাজেরা বলেছিল কাজে যাবে না। ও যেন তাড়াতাড়ি ফুল নিয়ে আসে। আজকাল রাতে চোখের কাজ করতে কষ্ট হয় মার, কালাম বুঝতে পারে। কিন্তু অসুখটা যে এত বেড়ে যাবে, তা বুঝতে পারেনি সে যাবার সময় তেমনটা মনেও হয়নি। সকালেও তো মা বলেছিল জলদি কইর‌্যা আসিস বাপ, ও বাড়ির ভাবী একরকম পাতা দিতে চাইছে। নিয়া আসুম নোতুন ধরনের মালা গাথুম এবার।"

"তুমি খানিক সময় শুইয়া থাকো, ঝাড়ু দেওয়া লাগবো না।" দ্বিরুক্তি না করে, মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়ে হাজেরা। ঝাঁট দেয় কালাম। সাফ করে ঘরের মেঝে, তারপর মার মাথায়, কপালে হাত বুলাতে থাকে। মাথার মধ্যে নানা ভাবনা মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পরে। কি করবে ও এখন ?

বন্যায় বাড়ি-ঘর, স্বামী, দুই সন্তান হারিয়ে ছয় বছরের কালামকে নিয়ে নয় বছর আগে ঢাকায় এসেছিল হাজেরা। করিমন খালা সঙ্গে না থাকলে কী সে করতো সে! বস্তিতে ঘর নিয়ে, কাঁথা সেলাই করে, বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে ছেলেকে প্রাইমারী স্কুলে পড়িয়েছে। পাঁচ বছর স্কুলে গেছে কালাম, তারপর আর পড়তে যায় নি। মার কষ্ট সে বুঝেছে। একটা চায়ের দোকানে কাজ করে, রাত জেগে পড়ে। একদিন সে স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করবে, কলেজের পড়াও শেষ করবে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা সে জানে। কষ্ট না করলে বড় মাপের মানুষ হওয়া যায় না, সে কষ্ট করবে। মায়ের দুঃখ দূর করবে। তার বয়সী ছেলেরা, অন্য হোটেলের কর্মচারীরা দল বেঁধে সিনেমায় যায়, ভালো কাপড়-চোপড়ও কেনে, সিগারেট খায়, বনভোজনেও যায়, কালামের মাঝে মাঝে ওদের দলে ভিড়তে ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাকায় মা'র মুখের দিকে তখন এসব খেয়ালের জন্য লজ্জিত হয়। না, আগে তাকে মানুষের মত মানুষ হতে হবে। মা'কে লোকের বাড়িতে কাজ করতে দেবে না সে। কিন্তু দু'জনের যা আয়, তাতে বাড়ি ভাড়া, খাই খরচার পর হাতে জমে না কিছু।

তিনবছর ধরে সে এই কাজটি করছে। ওদের স্কুলের সীমা আপা বলেছিলেন বিশ -এ

ফেব্রুয়ারীর রাতে তাঁর সঙ্গে শহীদ মিনারে যেতে। দলে ক'জন ছেলে থাকলে যাওয়া আসা সহজ হয়, নইলে আজে বাজে লোকেরা বিরক্ত করে। কালাম গিয়েছিল। সীমা আপারা আট নয়জন, তাঁর ভাইও ছিল সঙ্গে, সবাই ফুল কিনেছিল এক ফুলওয়ালার কাছ থেকে। সীমা আপা একা পঞ্চাশ টাকার ফুল কিনেছিলেন। কালাম দেখেছিল, অনেকেই ফুল কিনছে। সবাই তো সঙ্গে ফুল নিয়ে আসে না, বেশ চড়া দামে ফুল বিক্রি হচ্ছিল। সেই থেকে মাথায় এই চিন্তা। বিলাসের সঙ্গে ঘনিষ্টতাও। বিলাস তাদের দোকানে চা খেতে আসত মাঝে মাঝে, কথায় কথায় ও জানতে পারল টাকা পয়সার বিনিময়ে বিলাস মাঝে মধ্যে ফুল বিক্রি করে আর, মুফতে তো কতই দিতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কত লোকজনকে। না দিলে চলে না। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই ছিঁড়ে নেবে, গাছের ডাল পালা ভেঙ্গে চূরে একাকার করবে। সে জাত মালী, গাছের ক্ষতি না করে সে ফুল তুলতে জানে, বাড়তি ফুল বিক্রি করায় কোন দোষ নেই, সে তো গাছের অনিষ্ট করছে না।

কালামের সঙ্গে নিজের কোথায় যেন মিল খুঁজে পেয়েছিল বিলাস। সে-ই পরামর্শ দিল প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারীতে শহীদ মিনারে ফুল, ফুলের মালা দেওয়া হয়। ও ফরমায়েসী মালা, তোড়া বাসায় বাসায় দিয়ে আসে, তার থেকে কিছু ফুল কালামকে দেবে। মালার দাম বেশি, কিছু মালা বিক্রি করতে পারলে বাড়তি একটা রোজগার হবে কালামের। সে কালামের মা'কে 'আম্মা' বলে ডাকে - মাঝে মাঝে আনাজপাতি, মাছ, মুরগী নিয়ে এসে আব্দার করে "আম্মা, আজ কাজ থেকে জলদি জলদি চইল্যা আইস। তোমার হাতের পাক খাইমু।" তার নিজের মা নেই। বাবা, সৎমা আর ভাইবোন ক'জন গ্রামে থাকে। সে টাকা পাঠায়। সৎ ও পরিশ্রমী উদ্যান-রক্ষক হিসেবে তার সুনাম আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট ভবনে সে এক কামরার একটা বাসা পেয়েছে। কালামকে সে নিজের ছোটভাইয়ের মত ভালবাসে। বিলাসের কাছে গেলে হয়তো কিছু পরামর্শ পাওয়া যেত, এখন সে হয়তো নিজের কামরায় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে গল্প-গুজব করছে। হাজেরা অস্পষ্ট গলায় কি যেন বলে - কালাম নিজের মধ্যে ফিরে আসে। মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে- মুখ লাল টকটকে, মাথা কপাল আগুনের মত গরম, সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। কালাম নিজের বিছানায় যা কিছু ছিল, মায়ের গায়ে চাপাল। কিন্তু কাঁপুনি থামল না। বড় অসহায় বোধ করল কালাম, অধৈর্য হয়ে উঠল, ঝুপড়ির টাটকা, নানা রঙের ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখে পানি এল। কি করবে সে এখন ? পাশের কলোনীতে গিয়ে ডাক্তার হারুনকে মা'র কথা জানাবে ? চা-দোকানের বন্ধু রশীদকে ডেকে আনবে জিগাতলা থেকে। পরীবাগে সীমা আপার বাসায় গিয়ে ফুলগুলো দিয়ে আসবে, বিলাসের কাছে যাবার কথাও ভাবল সে? কিন্তু মা'কে একলা এমনভাবে রেখে যাবেই বা কি করে। পাশের ঘরে করিমন খালা

থাকে ? সে ঘরের দরজায় তালা লাগানো। কোথায় গেল খালা ? বিড় বিড় করে কি যেন বললো হাজেরা। একটা বাটিতে পানি নিয়ে কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে সে মা'র কপালে পট্টি দিতে লাগল। কখন যে তার চোখের পাতায় ঘুম নেমে এল, বুঝতেও পারল না।

কতগুলো শব্দে, ধড়মড় করে উঠে বসল সে। ঘরে বাতি জ্বলছে। কুপি নয়, হ্যারিকেন নয়, চার্জার। সারা ঘর ভরে গেছে আলোয়। করিমন খালা, সীমা আপা, বিলাস, আর একটি মেয়ে। মা ঘুমোচ্ছে। কপালে হাত দিয়ে দেখল ? স্বাভাবিক উত্তাপ।

করিমন বলল - "বিকালে আইয়া দেখি তর মার এই অবস্থা। তারাতারি গেলাম ডাক্তার সাবের বাড়ি। ওষুধ নিয়া আসার সময় মনে পইড়া গেল তর মা কইছিল ও বাড়ির ছুড ভাবী নোতুন পাতা আর ফুল দিব, সেখানে গিয়া ফুল পাতা নিয়া আসার সময় ভাবলাম, মালা গাঁথনের লোক পামু কই ? জিঞ্জিরায় গিয়া আমার বোনঝিরে নিয়া আসলাম। আইসা দেখি বিলাস বাবা আইসা পড়ছে। তর মালা গাঁথনের, কাজ প্রায় শেষ, ওঠ বাপ। খাইছস কিছু ?" সীমা বলল- "মনটা কেমন যেন করছিল। তুমি সেদিন বললে তোমার মার্ শরীর খারাপ বলে হোমটাস্ক করতে পারোনি। তাই চলে এলাম। যা হোক কিছু খেয়ে নাও, শহীদ মিনার থেকে ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে গিয়ে পেট ভরে খেও।" কালামের বিহ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিলাস হাসিমুখে বলল- " কি ভাবছিস ! তোর ভাবনা আল্লামিয়া নিজে ভেবে আমাদের দিয়া সব কাজ করাইয়া দিলেন। আমিও আম্মার কথা ভাইব্যা হঠাৎই আইস্যা পড়লাম। দেখি কি খালায় মাথা ধুইয়া দিছেন আম্মার, দাওয়াই খাওয়াইছেন, আর ঐ যে ছোট্ট ছেমড়ি. কুসুম, কুসুম দিয়া মালা গাঁথা শুরু করছে। একটু দেখাইয়া দিলাম, না দিলেও কুসুম ঠিক মালা গাইথ্যা শ্যাষ করত। ওর নাম কুসুম রাখছে কে খালা? "বিলাস জোরে হেসে উঠল। কালাম দেখল, প্রায় ওরই বয়সী একটি মেয়ে, ছাপা শাড়ি পরা, মাথা নীচু করে শেষ মালাটি গাঁথছে। ফুলের ডালায় একটিও ফুল নেই। মালাগুলো বিলাস সযত্নে সাজিয়ে রাখছে। কালামের দু'চোখ ভরে গেল পানিতে, হঠাৎই।

শাহরিয়ার খান

অবান্তর

ব্যস্ত বুড়িগঙ্গার পাশে দাঁড়ানো দ্বিতল বিশিষ্ট পুরাতন পরিত্যক্ত ভবন। ঠিক কি উদ্দেশ্যে ভবনটি নির্মিত হয়েছিল তা মামুনের অজানা। তবে এখানে সে প্রতি বিকেলেই একবার আসে। প্রথমে আসত তার বন্ধুদের সাথে, এখন একাই। ভবনটিতে যে যেমন পারছে দখল নিয়ে বসবাস করছে। সে যাই হোক, রেলিং বিহীন ছাদ ও সামনে বুড়িগঙ্গা বেশ উপভোগ্য। তবে বুড়িগঙ্গার উপভোগ করবার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আজ মামুন এই ছাদের এক কোনে বসে আছে। বসে আছে, ভাবছে, আর জ্বলন্ত সিগারেটে টান দিচ্ছে। কেটে যাচ্ছে সময়।

মামুন ভাবছে সেইসব দিনগুলোর কথা যখন আসিফ, সজিব, তারিক, এরা তার বন্ধু ছিল। তাদের জন্য তার মোটেই আক্ষেপ নেই। কিন্তু আক্ষেপ অবশ্যই একজনের জন্য আছে। হয়ত চিরকালই থাকবে। ঠিক এরকম কোন সন্ধ্যাতেই মামুন পরিচিত হয়েছিল মিতুর্ সাথে। এখনও স্পষ্ট সেই দিনটি। আসিফের জন্যই মিতুর সাথে পরিচিত হয়েছিল। আসলে আসিফ মিতুকে ভালোবেসেছিল।

উঠে দাড়ালো। বড্ড অস্থির লাগছে। এলোমেলো পায়ে হাটছে সে। চোখে পানি জমে আসছে। এরকম ইদানিং হয়। অস্থির লাগলেই চোখে পানি জমে, গলা শুকিয়ে যায়। গাজী ষ্টিমার নদীর জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। এর আগে চলে গেছে বরিশাল পটুয়াখালীগামী লঞ্চ। প্রতিটির নাম মুখস্থ হয়ে গেছে।

টান হয়ে শুয়ে পড়ল। ভাবতে শুরু করল আবার। কিছুই তো আর করার নাই। ঐ ঘুরেফিরে মিতুর কথাই সে ভাবে। সেবার হয়েছে কি, ... আসিফ, মিতু আর মামুন গিয়েছিল সিনেমা দেখতে। এখন সমস্যা হল রিকশা নিয়ে। মিতু আর আসিফ দুজনে এক রিকশায়। আর মামুন আলাদা একটায়। এসব যতই ভাবে ততই তার মেজাজ খারাপ হয়। তাও চিন্তা-ভাবনা ঠেলে সরিয়ে বারবার ঐ চিন্তাগুলো চলে আসে। আর-একবার হল কি, আসিফ আর মামুন গেল মিতুর বাসায়। মিতু কি কারণে যেন আসিফকে আসতে বলেছিল আর আসিফ আবার সাথে করে মামুনকে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ কথা বলতেই মামুন বেশ বুঝল, মিতু কি নিয়ে যেন ভাবছে। এক পর্যায়ে সে বলে ফেলল, "তুমি কি আমার সাথে একটু বেরুতে পারবে।" তারপর মামুনের দিকে চেয়ে বলল, "আমরা কিন্তু দুজনে যাবো। আসিফ আর আমি। তুমি মাইন্ড করলে না তো ?

আবার সেই সমস্যা হচ্ছে। কেমন যেন সমস্যা হচ্ছে। চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করলো। মামুন পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে এখন কি করছে। আর করবেই বা না কেন এই সতেরো বছরের জীবনে সে অনেক আঘাত পেয়েছে। কিছুক্ষণ পায়চারী করেই আবার শুয়ে পড়ল। নাহ্ আর পারল না। সেই স্মৃতিগুলো মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। স্মৃতিগুলোর মতোই মিতুর বাসায় ঘুরাঘুরি শুরু করল। মিতুকে আসল নাম আনোয়ার আলী মামুন না জানিয়ে সে জানিয়েছিল ছদ্মনাম ইমরুল কায়েস অঞ্জন।

এস.এস.সি. টেষ্টে মামুন কয়েক বিষয়ে ডাববা মেরে মিতুকে জানাল এবার এস.এস.সি. টেষ্টে সে প্রথম হয়েছে আর আসিফ হয়েছে সপ্তম। নিজেকে বেশ বড় একজন অফিসার তনয় হিসেবে পরিচয় দিল। একদিন বৃষ্টিতে ভিজে হিমু হয়ে মিতুর বাসায় উপস্থিত হল। সেদিন মিতু আর মামুন অনেক সময় গল্প করে কাটিয়ে দিল। মামুন তখন কিছুটা সুযোগ পেয়ে গেল। আসিফের বিরুদ্ধে কটু কথা বলতেও ছাড়ে নি।

একদম রাত হয়ে গেল। বাসায় ফিরলে বকাঝকা শুনতে হবে। এসব মামুনের জীবনে নতুন নয়। উঠে পরে পায়ে ঠিক যেখানে দাড়াল, এখানেই ওরা মামুনকে ধরে এনেছিল। মিতু আসিফ, তারিকদের সব বলে দিয়েছে। আসিফ যা ভাবার তা ভেবে নিয়েছে।

মাঝেমধ্যে মনে হয় কি, একজন পিয়নের ছেলের বোধহয় প্রেম করতে নেই। হতে পারে মিতু আসিফকে পছন্দ করতো বা ভালোবাসত কিন্তু আসিফ মিতুকে মোটেও ভালোবাসেনি। ওর ভালোরাসার এক অংশ মিথ্যা ছিল না যেমন ছিল না আসিফের ভালোবাসায় এক বিন্দু সত্য। মামুনের কয়জন বন্ধু মামুনকে অপমান করেছে, লাঞ্ছিত করেছে, চোরের ছেলে, পিয়নের ছেলে বলে গাল দিয়েছে। বন্ধুও গেল প্রেমিকও গেল। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। "প্রেমই ছিল না তাদের প্রেমিক। পিয়নের ছেলেদের কি প্রেম করতে আছে।"

হাসাহাসির শব্দে দোতলা থেকে দুজন লোক উপরে উঠে আসল। তারা দেখল একটি ছেলে অনবরত হাসছে। তারা এই হাসির অর্থ কিছু বুঝল না।

অ নি রু দ্ধ আ ল ম

কয়েকজন রোবট

পুপুনের মাথায় শেষ পর্যন্ত সফল অস্ত্রোপচার সম্ভব হলো। ওনিওন কাপ্পা রশ্মির বিকিরণে পুপুনের মাথায় সেরিব্রাল করটেক্স মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। মানুষের স্মৃতি, আবেগ ও বিচার-বিশ্লেষণ সংযুক্ত থাকে পুরো সেরিব্রাল করটেক্স এবং এর সন্নিহিত এলাকায়। বলা যায় স্মৃতি এই পুরো এলাকায় ছড়িয়ে থাকে। আর সেই সেরিব্রাল করটেক্স অপসারণ করে যদি কৃত্রিম সেরিব্রাল করটেক্স লাগাতে হয় তাহলে একজন মানুষের সম্পূর্ণ অস্তিত্বেরই পরিবর্তন ঘটে। তাই গত প্রায় দেড় সপ্তাহ ধরে আমি এবং রিরি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছি। শেষে আজ নিশ্চিত হতে পারলাম যে, পুপুনের মাথায় কৃত্রিম সেরিব্রাল করটেক্স সেট করতে হবে না অর্থাৎ পুপুন তার আগের স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে। আমার আর রিরির আনন্দ দেখে কে ! রিরি পুপুনের সেই ছোটবেলা থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এক সঙ্গে তারা দুজনে বড় হয়েছে। একই সঙ্গে পড়াশুনা করেছে। কেউ কাউকে ছাড়া এক মুহুর্ত থাকতে পারেনা।

'কিন্তু আমি কিছুতেই নিটো গ্রহে ফিরে যাচ্ছি না।' পুপুনের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল।

পুপুন, আমার প্রিয় ছাত্র। এ পর্যন্ত যতগুলো ছাত্র আমার হাত দিয়ে সফল ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে তাদের মধ্যে পুপুনই সবচেয়ে মেধাবী। আর পুপুনকে আমার সবচেয়ে বেশী যে কারণটির জন্য ভালো লাগে সেটি হলো - ও খুব শান্ত ছেলে এবং যে কোনো কাজে ভীষণ

মনোযোগী। এ পর্যন্ত তাকে আমি যতগুলো গবেষণামূলক কাজের এ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি সবগুলোই সে সফলতার সঙ্গে শেষ করেছে। বর্তমানে সে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ট্রিনটন গ্রহের তরুণ মেধাবী ডাক্তারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি সব সময়ই তার মঙ্গল কামনা করি। কিন্তু সেই আমিই তার প্রায় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবতেই ভীষণ খারাপ লাগে।

পুপুন বলল, 'স্যার নিটো গ্রহের অধিবাসীরা খুব একটা সুবিধের নয়। ওদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকাই ভালো।'

আমি বললাম, 'ওরা যত ভয়ঙ্করই হোক-তা আমাদের দেখার বিষয় নয়। ওরা আমাদের সাহায্য চেয়েছে এটাই বড় করে দেখতে হবে। বিপদ গ্রস্থকে সাহায্য করা মানবতার ধর্ম।'

'কিন্তু ওদের মধ্যে কোন কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। ওরা এখনও অশিক্ষিত-আদিম-বন্য-হিংস্রই থেকে গেছে।

'তবুও আমাদের সাহায্য করতে হবে।' আমি খুব দৃঢ় কণ্ঠে পুপুনকে লক্ষ্য করে বললাম, 'এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে নিটোবাসীর অধিকাংশই মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করছে। তুমি নিটোতে যাবে এবং এ রোগের কারণ অনুসন্ধান করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ অজানা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে নিটোবাসীকে ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা কর। তুমিই এ কাজ করতে পারবে। তোমার মত মেধাবী-ধীর-স্থির তরুণ বিজ্ঞানীর পক্ষেই এ ধরণের গবেষণামূলক ঝুকিপূর্ণ এ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণ করা সম্ভব।'

এর পরে পুপুন আর কোন কথা বলেনি। বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করে।

নিটো গ্রহে পাড়ি দেয়ার উদ্দেশ্য পুপুনের সফল হয়েছিল। এন-থ্রাই-জিরো-এক্স জীবাণুর আক্রমণ থেকে উদ্ধার করার পর যখন ফিরে আসতে চাইল ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটল বিপত্তিটা। এই ভেবে নিটোবাসীদের মাথায় জেদ চেপে বসল যে - পুপুনকে কিছুতেই হাত ছাড়া করা যাবে না। ওকে ছাড়লে ওদের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে। পুপুনের মত একজন যাদুকর বিজ্ঞানী ও গবেষক সবসময়ই তাদের দরকার - যে কিনা নিমিষেই অচেনা-অজানা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করে মৃত্যুর দুয়ার থেকে যে কাউকেই ফিরিয়ে আনতে পারে।

পুপুন নিটোবাসীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক - সে সব সময়ই নিটোবাসীদের পাশে থাকবে। যে কোনো বিপদে খবর দেয়া মাত্রই সে ছুটে আসবে।

কিন্তু নিটোবাসীরা রাজী হয়নি পুপুনের কথায়। তারা পুপুনকে বন্দী করে।

এরপর পরেই পুপুনকে নিয়ে ট্রিটনবাসী এবং নিটোবাসীদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ লেগে যায়। যুদ্ধে হেরে যায় নিটোবাসীরা। নিটোবাসীদের কাছ থেকে পুপুনকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু তার আগেই

নিটোবাসীরা ওনিওন কাপ্পা রশ্মি দিয়ে পুপুনের উপর আঘাত করে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা চালায়।

বেচারা পুপুনের জন্য ভীষন দুঃখ হয়। পুপুনের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ পুপুনের কথায় পাশ ফিরে চাইলাম। স্বচ্ছ নীল কাঁচের তৈরী ক্যাপসুলের মধ্যে পুপুনের মুখ নাড়ছে অর্থাৎ কথা বলছে। সেই কথা এনাসাইম ভারবাল ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে রেকর্ড ও পরিবর্ধিত হয়ে সারা হল রুমে ছড়িয়ে পড়ছে।

'স্যার আমাকে আর কখনও নিটো গ্রহে পাঠাবেন না।' পুপুনের গলার স্বর ক্ষীণ শোনাল।

পুপুনের কথায় আমার মনে একটা চাপা বেদনা ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু পুপুনকে কিছুই বলতে পারলাম না।

পুপুন আবার বলল, 'স্যার আমাকে আর নিটো গ্রহে পাঠাবেন না। আর কখনো আমাকে নিটো গ্রহে পাঠাবেন না। আমি আগেই বলেছিলাম ওরা বড় বর্বর, অশিক্ষিত।' করুণ আর্তি মেশান পুপুনের কথায় কান্নার সুর অনবরত প্রলাপ বকার মত শোনাল।

এবার আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। কথাগুলো তাহলে পুপুনকে বলতেই হয় - যে কথাগুলো বলার জন্য দিনের পর দিন মেধা ও শ্রম ক্ষয় করে পুপুনকে এত বড় বিজ্ঞানী হিসেবে গড়ে তুলেছি।

'পুপুন!' আমি অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর গলায় বললাম, 'তোমাকে আরও একবার নিটো গ্রহে যেতে হবে এবং তা চিরকালের জন্যেও বলা যেতে পারে।' জানিনা এনাসাইম ভারবাল ট্রান্সমিটারে আমার কথাগুলো ট্রান্সমিট হয়ে পুপুনের কাছে কেমন শোনাল। তবে দেখলাম পুপুনের শান্ত চোখের দৃষ্টিতে হঠাৎ করে চঞ্চলভাব জেগে উঠল। সে আরও মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'স্যার আমি আর নিটোতে কিছুতেই যাচ্ছি না।'

'তোমার প্রয়োজনে তোমাকেই যেতে হবে।'

'আমার প্রয়োজনে?' পুপুনের চোখেমুখে যেন একটা ভয়গ্রস্থ বিস্ময়পূর্ণ ভাব ফুটে উঠল।

'হ্যাঁ, তোমার প্রয়োজনে।' আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে ফেললাম। বললাম, 'তুমি কি জান আমি তোমার মত একজন স্বাভাবিক মানুষ নই?' কথাগুলো থেমে থেমে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বললাম।

'তাহলে আপনি ... ?' পুপুনের কথা তার মুখেই থেকে গেল।

'তোমার মত আমি মানবিক অনুভূতি সম্পন্ন হলেও আমি সম্পূর্ণ মানুষ নই। শুধু এটুকুই জেনে রাখ। আর এও জেনে রাখ আমার মত এ গ্রহে অনেকেই রয়েছে।'

'রিরি-ও কি তাই?' দেখলাম রিরির কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে পুপুনের গলার স্বর কেঁপে কেঁপে গেল। বুঝলাম রিরির মত একটি সুন্দর স্নিগ্ধ মনের মেয়ের

প্রসঙ্গ টেনে পুপুন নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

'না, না, রিরি তোমার মতই একজন মানুষ। শুধু রিরি কেন - তোমার অন্যান্য বন্ধু প্রুন, ইনা, কিকো, ক্রিনা, যত আছে সবাই মানুষ। শুধু আমি এবং তোমাদের যে কয়জন শিক্ষক আছেন...।

'মানুষ নন। এই তো বলতে চাইছেন ?'

'ওসব এখন থাক।'

'তাহলে আপনার প্রকৃত পরিচয়টি কি ?' পুপুন এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

'তার আগে তোমাদের অর্থাৎ তোমার, নিনা, ব্রুনো, মিরান, প্রুন, আলান, কিকো- এগের প্রকৃত পরিচয়টা দিয়ে নিই।' পুপুনের দিকে না তাকিয়েই হড়বড় করে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছর আগের ঘটনা। পৃথিবী নামের একটি সুন্দর গ্রহে ছিল মানুষের আদি বাস। মানুষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের এত বেশী উন্নতি সাধন করেছিল যে তারা তাদেরই মত জ্ঞান-বুদ্ধি অনুভূতি সম্পন্ন রোবট নামের যন্ত্রের অবিকল মানুষ তৈরী করে ফেলে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছানোর সাথে সাথে মানুষেরা বেশি বেশি করে নিজেদের মধ্যে কলহে জড়িয়ে পড়ে। তারা যন্ত্রের মানুষদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে লাগল। মানুষদের এই পরস্পর বিরোধী যুদ্ধের বিরোধীতা করে ইবনু নামের একজন নামকরা বিজ্ঞানী রোবট। কিন্তু ইবনুর কথা তারা শোনেনি। অবশেষে তারা ভয়ংকর পারমানবিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পারমাণবিক বিস্ফোরণে পৃথিবীর শহর-বন্দর-নগর একের পর এক ধ্বংস স্তুপে পরিণত হতে থাকে। ধীর গতি সম্পন্ন নিউট্রন দ্বারা ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে আঘাত করার মাধ্যমে এবং নিউক্লিয়াসকে ক্রমাগত বিশ্লিষ্ট করে এই পানমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটান হত। ঠিক সেই মুহূর্তে মানব জাতির ধ্বংস আসন্ন উপলব্ধি করেই ইবনুসহ কয়েকজন রোবট ছয়-সাতশ'র মতো মানব শিশুকে শীতল ঘরে ঘুম পাড়িয়ে স্পেসশীপে করে পৃথিবী থেকে পালিয়ে নিয়ে আসে অন্য এক গ্রহে। অপর দিকে যে সকল মানুষ পৃথিবীর পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিল তারা এসে আশ্রয় নেয় সম্পূর্ণ এক অচেনা গ্রহে। এই গ্রহে মানবজাতি নতুন করে আবাস তৈরী করলেও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় এখানে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানে তেমন উন্নতি সাধন করতে পারেনি। এবার বুঝতে পারছ তো। তুমি কে এবং আমার প্রকৃত পরিচয়টা কি ?'

'আপনি তাহলে সেই ডক্টর ইবনু- যার লেখা পড়ে আমরা এতদিন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়েছি।'

'ট্রিনটন গ্রহে অবস্থান নেবার পর পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে বাঁচার তাগিদে পৃথিবী থেকে ছিটকে আসা মানবজাতির অপর অংশকে আমি খুঁজে পাই নিটো গ্রহে। এরপর কয়েকশ বছর কেটে গেছে। মানব-শিশুদেরকে শীতল ঘর থেকে জাগিয়ে তুলি।

তাদেরকে সত্যিকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নেই আমি এবং আমার সাথীরা- এই আশা নিয়ে যে, তারা একদিন নিটো গ্রহেরা মানুষদের মাঝে ফিরে যাবে - নতুন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো জ্বালাবে মানুষের মাঝে। তাদেরকে সত্যিকারের মানবতার দীক্ষা দেবে।' থমথমে গলায় একটানা কথাগুলো বলে গেলাম।

'কিন্তু আমি কিছুতেই নিটো গ্রহে ফিরে যাচ্ছি না।' পুপুনের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল।

'তোমাকে নিটো গ্রহে ফিরে যেতেই হবে। তোমার পূর্ব পুরুষদের মাঝে তোমাকে ফিরে যেতেই হবে।'

'কিন্তু ওরা বড় বর্বর। বড় হিংস্র। কোনো যুক্তি-তর্ক মানে না। সব সময় হিংসা হানাহানি নিয়েই থাকে। কুসংস্কারে ডুবে থেকে ওরা অন্ধ হয়ে গেছে। ওদেরকে আমার বড় ভয়।'

'তারপরেও ওরা মানুষ। তোমার পূর্বপুরুষ। তুমি, মিয়ান, রিরি, আলান- তোমরা সকলেই তাদের বংশধর।'

'কিন্তু স্যার, আপনাকে ছাড়া আমি কোথাও যাব না।'

'আমি একজন রোবট। একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে আমার কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি হলেও আমার অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেগুলো একজন রোবট কোনদিনই নিজের ইচ্ছায় অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু একজন মানুষ অনন্ত সম্ভাবনার উৎস। সে ইচ্ছে করলে অনেক সীমাবদ্ধতাই অতিক্রম করতে পারে। মানুষকে দিয়ে যে সম্ভাবনার কথা চিন্তা করা যায় রোবটকে নিয়ে তা সম্ভব নয়। তাই আমি চাই তুমি এবং তোমার বন্ধুরা নিটোগ্রহে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে তোমরা নিটোবাসীদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। তাদেরকে সংযম ও সহিষ্ণুতার দীক্ষা দেবে। তারা যেন আর আত্মঘাতী না হয়। তোমরা সবাই একেকজন শান্তির দূত হয়ে গিয়ে নিটোবাসীদেরকে বিপদগামীতা থেকে রক্ষা করবে। এভাবেই আমি তোমাদেরকে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরী করেছি- যাতে করে তোমরা এই অভিযানে সফল হও।'

'কিন্তু...।'

'কোনো কিন্তু নয়। তোমরা নিটোবাসীদেরকে পৃথিবীতে ফেরার স্বপ্ন দেখাবে। এতদিনে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া পৃথিবী সজীব হয়ে উঠেছে। পৃথিবী আর ধ্বংস ও আতঙ্কের প্রতীক নয়। তোমরা নিটোবাসীকে বোঝাবে পৃথিবীই হলো আমাদের সকল স্বপ্ন ও আশার একমাত্র প্রতীক। আর নিটোবাসীকে পৃথিবীর নতুন স্বপ্ন দেখাবার এই যে অভিযান- তার মূল নেতৃত্ব দেবে তুমি।'

'এ-তো ভীষণ অসম্ভব কাজ।'

'তুমি পারবে। এটাই তোমার জীবনের শেষ এ্যাসাইনমেন্ট। তুমি যাতে এ ব্যাপারে

কৃতিত্বের সঙ্গে সফল হও সে ব্যাপারে আমি এবং আমার সঙ্গীরা তোমাকে তোমার অজান্তেই একশত ভাগ নিশ্চিয়তার সঙ্গে সবধরণের প্রশিক্ষণ দিয়েছি।'

'স্যার আপনি ? আপনি কোথায়...

পুপুনকে কথাগুলো শেষ করতে দেয়ার আগেই বললাম, 'আমি আজই পৃথিবীতে চলে যাচ্ছি। সেখানে অনেক কাজ। পৃথিবীকে আবার নতুন করে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তুলতে হবে। এক দণ্ডও অবহেলা করে সময় নষ্ট করা যাবে না। পৃথিবীতে ফেরার পর তোমাদেরকে যাতে মারাত্মক কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয় সে জন্যে আমাকে আগেই পৃথিবীতে ফিরতে হচ্ছে। সঙ্গে আমার অন্য সঙ্গীরাও যাচ্ছে।'

'কিন্তু স্যার, আপনারা চলে গেলে আমরা একা একা কি করব ?'

'তোমারা কখন কোন্ কাজ কিভাবে করবে, কোনো সমস্যায় পড়লে কি কি পদক্ষেপ নেবে সবই আমাদের সেন্ট্রাল কম্পিউটার মিকিতে প্রোগ্রাম করা আছে। সেই সঙ্গে তোমাদের সাথে রইল আমাদের দেয়া বাস্তব প্রশিক্ষণ। সবকিছু গুছিয়ে দিয়ে গেলাম। আমি পৃথিবীতে অবস্থান করলেও মিকির মাধ্যমে যথা সময়ে আমার সব নির্দেশ তোমরা পেয়ে যাবে।'

'তারপরও স্যার...।'

'নাহ্ তার আর পর নেই। আজ থেকেই নিটোবাসীদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে নেয়ার তোমাদের যে মিশন তা শুরু হলো। আমি এখনই বিদায় নিচ্ছি। বিদায় পুপুন ! বিদায়!

অনুবাদ গল্প

রে ব্রাডবেরী

হাসি

অনুবাদ □ হাসান খুরশীদ রুমী

'সবাই তাই বলে, টম, কিন্তু কথাটা মিথ্যা। এটা আসলে ৫০০০ সালও হতে পারে। সময়ের হিসাব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমরা এখন যা কিছু পেয়েছি সবই উল্টা-পাল্টা আর গোলমেলে।'

সেই ভোর থেকে শহরের প্রাণকেন্দ্রে খোলা চত্বরে জটলা করছে লোকগুলো। অদূরবর্তী গ্রাম থেকে ভেসে আসছে মোরগের ডাক। তবে এখান থেকে এই মুহুর্তে কোন আভা দেখা যাচ্ছে না। চোখে পড়ছে কেবল বিধ্বস্ত কিছু দালান-কোঠা। ভোরের দিকে কুয়াশা পড়ছিল, ইতোমধ্যে সাতটা বেজে গেছে, রোদে ঝলসিয়ে উঠেছে চারপাশ। একজন-দু'জন করে আসতে শুরু করেছে লোকেরা। আজ হাট-বার। উৎসবের দিন।

দু'জন লোক লাইনে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় কথা বলছে। বাচ্চা একটা ছেলে পেছনে দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের কথা। শীত তাড়ানোর জন্যই বোধ হয় জোরাল গলায় কথা বলছিল ওরা। ছেলেটি সজোরে মাটিতে পা ঠুকল। পরনের লাল পোষাক থেকে ধুলো ঝারল। তারপর তাকাল পাটের তৈরী পোশাক পরা লোক দুটোর দিকে, পরক্ষণেই দৃষ্টি ফেরাল দাঁড়ানো একজোড়া নারী-পুরুষের দিকে।

এই ছেলে সাত সকালে এখানে কি করছ তুমি ? ছেলেটার পেছনে দাঁড়ান একজন জিজ্ঞেস করল।

'লাইনে দাঁড়িয়েছি' বলল ছেলেটা।

'ব্যাপারটা বোঝে এমন কাউকে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে কেটে পড় না কেন ?'

'ওকে জ্বালিয়ো না' ছেলেটার সামনে থেকে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল লোকটা।

'না, মানে একটু মস্করা করছিলাম, ছেলেটার মাথায় হাত রাখল প্রথমজন। মৃদু ঝাঁকি দিয়ে হাতটা সরিয়ে দিল ছেলেটা। 'ছেলেটি এত সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে দেখা অবাক হয়েছি।'

'ও-ও আর্ট বোঝে হয়ত। তোমার ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করছে, বলল দ্বিতীয়জন, গ্রিগরী তার নাম, 'খোকা নাম কি তোমার?'

'টম।'

'ছবিটার ওপর থুথু মারবে তুমি তাই না, টম ?

'হ্যাঁ।'

লাইনের সবাই হেসে উঠল।

ফাটা কাপে গরম কফি বিক্রি করছে এক লোক। টম দেখল, হালকা আগুনের আঁচে নোংরা প্যানে রাখা কফি ফুটছে। আসলে কফি নয় ওটা। শহরের বাইরে তৃণভূমিতে একরকম বুনো ফল পাওয়া যায়। সেই ফলের রস গরম করে প্রতি কাপ এক পেনী দরে বেচে সে। খেলে গা গরম থাকে। অবশ্য সবাই কিনছে না, কারণ অনেকের কাছেই তেমন টাকা পয়সা নেই।

লাইনটা যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখানে বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একটা পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকাল টম।

'সবাই বলছে ছবির মেয়েটা নাকি হাসছে ?' জিজ্ঞেস করল টম।

'হ্যাঁ ঠিকই তো, 'গ্রিগরী বলল।

'শুনলাম ওটা তেল রংয়ে আঁকা ?'

'ঠিক। সে জন্যেই কেন যেন আমার মনে হচ্ছে ছবিটা আসল নয়। আসল ছবিটা নাকি বহুদিন আগে কাঠের ওপরে আঁকা হয়েছিল।

'সবাই বলছে। ছবিটা নাকি চারশো বছর আগের ?'

'আরও বেশীও হতে পারে। এখন কোন সাল

চলছে কেও জানে না।

'২০৬১ সাল এটা।'

'সবাই তাই বলে, টম, কিন্তু কথাটা মিথ্যা। এটা আসলে ৫০০০ সালও হতে পারে। সময়ের হিসাব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আমরা এখন যা কিছু পেয়েছি সবই উল্টা-পাল্টা আর গোলমেলে।'

ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঠাণ্ডা পাথুরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

'আর কতক্ষণ লাগবে ?' অস্বস্থির সঙ্গে প্রশ্ন করল টম।

'এই তো আর কয়েক মিনিট। চারটে পেতলের পোল থেকে ভেলভেটের দড়ি দিয়ে ঝোলান হবে ছবিটা। মনে রেখ কেবল থুথু, পাথর ছোড়া নিষেধ। পাথর ছোঁড়ার অনুমতি নেই।'

সূর্য আকাশের আরও ওপরে উঠে এসেছে। তাপমাত্রা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষগুলো তাদের পরনের ময়লা কোট এবং তৈলাক্ত টুপি খুলে ফেলেছে।

'আমরা লাইনে দাঁড়িয়েছি কেন ?' টম জানতে চাইল।

'আর থুথুই বা ছেটাতে হবে কেন ?'

টমের দিকে না তাকিয়ে সূর্যের দিকে নজর দিল গ্রিগবী। 'অনেক কারণ আছে তার টম।' অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিল সে সিগারেটের খোঁজে। সিগারেট নেই। 'এখানকার মানুষ অতীতের সবকিছুকে ঘৃণা করে। তুমিই বলো না টম, এই শহরটাকে আমরা কি অবস্থায় পেয়েছি। বোমায় বিধ্বস্ত শহর এটা। রাতে অর্ধেকটা ফসলের ক্ষেতে তেজষ্ক্রিয় আলোয় জ্বল জ্বল করে। মানুষের ঘৃণার কারণ এটাই।'

'ঠিক বলেছেন, বুঝেছি।'

'ঘৃণা করাটা খুবই স্বাভাবিক, টম। যে অতীত আমাদের সর্বনাশা এনেছে, ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে সব, সেই অতীতকে ঘৃণা করাই উচিত। মানুষের স্বভাবও তাই। হয়ত চিন্তাশক্তির দৈন্যতা আছে বলে। কিন্তু স্বভাব স্বভাবই।'

'অন্য কিছুকে তো ঘৃণা করি না আমরা, বলল টম।'

'ঠিক অতীতের নির্বোধ মানুষ যারা পৃথিবী শাসন করতো, তাদের জন্যই আজ আমাদের এ অবস্থা। ওদের কারণে আজ বৃহস্পতিবার সকালে খালি পেটে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। এখন গুহায় থাকি আমরা। সিগারেট খাই না, মদও না। এ উৎসবটা ছাড়া কিই বা আছে বলো টম।'

টমের মনে পড়ে যায় বছরের উৎসবগুলোর কথা। গত বছর এ সময় শহরের খোলা চত্বরে দাঁড়িয়ে একের পর এক বই ছিঁড়ে পুড়িয়েছিল ওরা। তারপর মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে। একমাস আগে হয়েছিল বিজ্ঞান উৎসব। পৃথিবীর শেষ গাড়িটা শহরের খোলা চত্বরে আনার পর লটারী হলো। লটারীতে বিজয়ীদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে হাতুড়ি দেওয়া হলো গাড়িটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য।

'সে সব কথা কি ভোলা যায়, টম ?' ভোলা সম্ভব ? সেই গাড়িটার সামনের কাঁচটা আমিই ভেঙ্গেছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই শুনেছিলে ? মাই গড, কি দারুণ শব্দ হয়েছিল তখন।'

টম শব্দটা শুনেছিলে। কাঁচের টুকরাগুলো ঝিক্‌মিকিয়ে ঝরে পড়েছিল রাস্তায়।

'বিল হেন্ডারসন ভেঙ্গেছিল এঞ্জিন। কি সুন্দরভাবেই না কাজটা করেছিল সে।'

কিন্তু গ্রিগবীর আসলে সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছিল এরোপ্লেন ফ্যাক্টরীটা ভাঙতে।

'ওহ্ খোদা, সত্য দারুণ ভাল লেগেছিল ওগুলো ভাঙতে।' বলল সে। 'কাগজের প্লান্ট আর অস্ত্রের ডিপো দু'টোকে তো একসাথেই বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলাম আমরা। বুঝতে পারছ টম ?'

টম ধাঁধায় পড়ে গেল। বলল, 'চেষ্টা করছি।'

সূর্য মাথায় ওপর, দুপুর। গরম বাতাসে ভাসছে ধ্বংস স্তুপের দূষিত গন্ধ। ওইসব ভাঙ্গা দালান কোটার ভেতরে এখন কীটপতঙ্গের রাজত্ব।

'ওসব কি আর ফিরে আসবে না ?'

'সভ্যতা ? না কেউ চায় না। আমিও না।'

'আমি অবশ্য চাই, তবে সীমিতভাবে,' পেছন থেকে বলে উঠল একজন। 'সভ্যতার কিছু কিছু ব্যাপার সতিই সুন্দর।'

'এখানে সভ্যতার সৌন্দর্য রাখার কোন ঠাঁই নেই, গ্রিগরী চেঁচিয়ে বলল।

অন্য লোকটার পেছন থেকে এবার আর একজন বলে উঠল, 'হয়ত একদিন স্বাপ্নিক কারও আগমন ঘটবে, যার হৃদয় আছে, যে এসে উদ্ধার করবে আমাদের। লক্ষ্য করো আমি হৃদয়বান ব্যক্তির কথা বলেছি কিন্তু।

'না, তা হবে না।' গ্রিগবী বলল।

'আমি বলছি, হবে। কেউ একজন আসবেই যার হৃদয়টা খুব সুন্দর। সে আমাদেরকে সভ্যতার কাছাকাছি নিয়ে যাবে। শান্তিতে বসবাস করব তখন আমরা।

'তোমার বোঝা উচিত, এরপরেই বেঁধে যাবে যুদ্ধ।'

'হয়ত আগামীতে তেমনটা ঘটবে না।

'একটি ঘোষণা, ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা একলোক জানাল, কর্তৃপক্ষ আজ দুপুরে শহরে খোলা চত্বরে ছবিটা সমবেত জনতার হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সবাই যাতে ওটা ধ্বংস করতে পারে-'

টম কিছু বলার আগেই দুলে উঠল জনতা। ছবিটার দিকে এগোচ্ছে সবাই। কাপড় ছেঁড়ার শব্দ পাওয়া গেল। পুলিশ মানুষের চাপে সরে পড়েছে। পাগলের মত চেঁচাচ্ছে জনতা। ক্ষুধার্ত পাখির মত ছবিটায় ঠোকর মারছে হাজার হাজার মানুষ। অন্যদের মত টমও হাত বাড়ায় এক টুকরো ক্যানভাস তার হাতে আসে। তারপর মাটিতে পড়ে গেল টম। লাথি খেয়ে গড়াতে গড়াতে পৌঁছে গেল ভিড়ের কিনারায়। রক্তাক্ত অবস্থা। পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে। ও দেখতে পেল ক্যানভাসের টুকরো চিবুচ্ছে বুড়িগুলো, আর

পুরুষগুলো ফ্রেম ভাঙ্গছে, ছেঁড়া কাপড় ছুঁড়ে ফেলছে।

টম দাঁড়িয়ে আছে একা। চত্বর এখন শান্ত। হাতের দিকে তাকাল সে। একটুকরো ক্যানভাস বুকে চেপে ধরে রেখেছে।

'টম!' গ্রিগবী ডাকছে।

সাড়া দিল না টম। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। বোমা-বিধ্বস্ত রাস্তা বরাবর দৌড়তে শুরু করল সে। মাঠ পেরিয়ে ছোট্ট নদীটা পার হয়ে একটানা ছুটে চলল সে। পেছনে তাকাচ্ছে না একবারও। কোটের নিচু বুকের কাছে মুঠোয় একটুকরো ক্যানভাস ধরে রেখেছে সে।

সূর্যাস্তের সময় একটা ছোট গ্রামে পৌঁছুল সে, সেই গ্রামও পেরিয়ে গেল সে। নটা নাগাদ একটা ভাঙ্গাচোরা ফার্মে এসে পৌঁছুল। ফার্মের পেছন দিকে একটি সাইলোর খানিকটা অংশ তখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নাক ডাকার আওয়াজ কানে এল টমের। একটি পরিবার ঘুমুচ্ছে- ওর বাবা, মা এবং ভাই। দ্রুত অথচ নিঃশব্দে ছোট দরজা গলে ভেতরে ঢুকে শুয়ে পড়ল সে।

'টম?' অন্ধকারে ডাকল ওর মা।

হ্যাঁ, মা।'

'গিয়েছিলি কোথায়?' রাগত কণ্ঠে জানতে চাইল বাবা। 'দাঁড়া সকাল হোক তোর পিঠের চামড়া তুলে নেব আমি।'

অন্ধকারে ভাই লাথি মারল ওকে। টম না থাকায় আজ দিনভর জমিতে কাজ করতে হয়েছে তাকে।

'শুয়ে পড়।' দুর্বল কণ্ঠে বলল ওর মা।

আরেকটা লাথি খেল টম।

টম শুয়ে আছে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। বুকের কাছে মুঠি করে রেখেছে হাত। ওই ভাবে আধাঘন্টার মত চোখ বুঝে শুয়ে রইল সে।

তারপর চোখ মেলল, চাঁদ উঠেছে আকাশে। অনেক উপরে। সাইলোর ফোকর দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ল টমের গায়ে, তখনই হাতের মুঠি আলগা করল সে। ধীরে সাবধানে, সবাই ঘুমুচ্ছে নিশ্চিত হয়ে মুঠোয় ধরা ক্যানভাসের টুকরোর দিকে তাকাল।

চাঁদের আলোয় ভিজে সারা পৃথিবী ঘুমুচ্ছে।

টমের হাতে মোনালিসার হাসি।

মধ্যরাতের চাঁদের দিকে তাকাল সে। আপন মনে বারবার বলতে লাগল, 'হাসি, সুন্দর হাসি।'

ঘন্টাখানেক বাদে ক্যাভাসের ছেঁড়া টুকরোটা সযত্নে ভাঁজ করে লুকিয়ে রাখল সে। চোখ বুজে শুয়ে রইল তারপর। কিন্তু সেই হাসি ঠিকই জেগে থাকল অন্ধকারেও। যখন সে ঘুমিয়ে পড়ল, পৃথিবী নীরব হয়ে গেল। ঠাণ্ডা আকাশে চাঁদ যখন ডুবছে ভোরের আভাস দিয়ে, তখনও উষ্ণ ও প্রশান্তিজড়ান সেই হাসি জেগে থাকে।

ইমদাদুল হক মিলন

নেতা যে রাতে নিহত হলেন

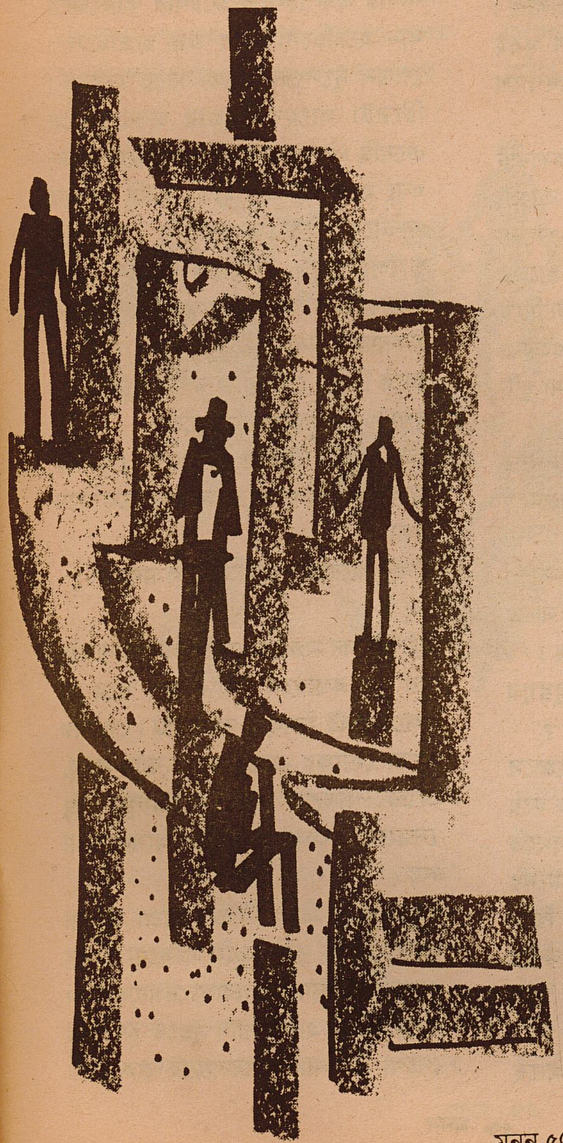

পুলিশ অফিসার সুবেশ মার্জিত ধরণের। চেয়ারে গা এলিয়ে খুবই আয়েশি ভঙ্গিতে সিগ্রেট টানছিলেন তিনি। টেবিলের সামনে দুজন সাধারণ পুলিশের সঙ্গে অত্যন্ত নিরীহ, গোবেচারা, গ্রাম্য লোকটিকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন।

কিন্তু বসার ভঙ্গিটি বদলালেন না। সিগ্রেটে টান দিয়ে বললেন, কী, ঘটনা কী?
দুজন পুলিশের একজন বললো, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছিলো।
অপরজন সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমারও স্যার। লোকটির চালচলন আচার আচরণ খুবই সন্দেহজনক। নেতার বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করছিলো সে।
নেতার কথা কথা শুনে পুলিশ অফিসারটি বেশ ধাক্কা খেলেন। গা এলানো ভাবটা মুহূর্তে কেটে গেলো তাঁর। চেয়ারে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। টেবিলের ওপর, হাতের কাছে ছিলো তাঁর পুলিশি টুপি। টুপিটা নিয়ে যত্ন করে মাথায় পরলেন। যেনো এইমাত্র দায়িত্বে বহাল হলেন। এতক্ষণ যেনো ছুটি কাটাচ্ছিলেন।
অফিসার নড়চড়ে উঠলেন। নেতাকে দেখতে এসেছো মানে কী? নেতাকে তুমি চেনো? নেতা তোমাকে চেনেন?
রতন অমায়িক মুখ করে বললেন, নেতাকে কে না চেনে সাহেব! তাঁরে চিনবো না এ হয় নাকি। নেতাও তো দেশের মানুষ।
তুমি যে নেতার বাড়ির পাশে ঘুরঘুর করছিলে, বাড়ি তুমি চিনলে কী করে?
লঞ্চ থেকে নেমে লোকজনকে জিজ্ঞেসে করতে করতে চলে গেছি ম্যালা রাত হয়ে গেছে এতো রাতে তো নেতাকে আর দেখতে পাবো না ভাবছিলাম তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তায় বসে থাকবো। দিনের বেলা তিনি যখন বেরুবেন দুচোখ ভরে তাঁকে একবার দেখবো। পোটলাটা নামিয়ে রাখবো তাঁর পায়ের কাছে।
অফিসার হাসলেন। মাথায় ছিট আছে তোমার?
জ্বে না সাহেব?
পোটলায় কি?
চিরে। খুব ভালো চিরে সাহেব। বাড়ির নামায় এক চিলতে জায়গায় কালিজিরে ধান হয়েছিলো। খুব অল্প হয়েছিলো। পোনে দুসেরের মতো চিরে হয়েছে। চিরেটা সাহেব নেতার জন্যে নিয়ে এসেছি। নেতা এক মুঠ মুখে দিলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে আমার। আমি সাহেব নেতাকে বড়ো ভালোবাসি। গরীবের ভালোবাসা। নেতাকে কেমন করে জানাবো। ম্যালা দিনের স্বপ্ন ছিলো তাঁরে একবার সামনা সামনি দেখবো। পায়ের কাছে চিরের পোটলাটা নামিয়ে রেখে পা দুখানা একবার ছুঁয়ে দেখবো।
রতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। সে আর হলো কই! আপনার লোকজনে ধরে নিয়ে এলা।
ঠিকই করেছে। তুমি আসলে বদমাস।
জ্বে!
হ্যাঁ তুমি বদ মতলবে নেতার বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করছিলে। এতোক্ষণ ধরে যা বললে সবই মিথ্যে। বানোয়াট। তোমার মতো লোকের এতো পয়সা ব্যায় করে, এতো পরিশ্রম করে, এতোদূর শুধু নেতাকে একপলক দেখতে আসার কথা নয়।
অতোগুলো চিরে বিক্রি করলে ভালো পয়সা পেতে তুমি। তুমি এসেছো নিশ্চয় কোনো মতলবে ভালোবাসা দেখাতে নয়।
এতোক্ষণের হাসি মুখটা মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে গেলো রতনের। একেবারেই স্তব্ধ হয়ে

গেলো সে। কাতর গলায় বললো, না সাহেব না। আমি একটাও মিথ্যা বলি নাই। আমরা মিথ্যা কথা বলি না। মানুষ গরীব হতে পারি সাহেব কিন্তু আমাদের ভালোবাসাটা খাঁটি আমাদের মতো গরীব মানুষরাই নেতাকে বেশি ভালোবাসে সাহেব। আল্লার কসম খেয়ে বলছি আমি নেতাকে দেখতে আসছি। এ আমার ম্যালা দিনের স্বপ্ন। আপনে বিশ্বাস করেন।
একটু একটু করে অনেকক্ষণ ধরে জমে ওঠা রাগটা এবার ফাটলো অফিসারের। প্রচন্ড রেগে একটা ধমক দিলেন তিনি। চোপ। সেই ধমকে রতন তো বটেই পাথর হয়ে থাকা পুলিশ দুজনও কেঁপে উঠলো। পুলিশ দুজনের দিকে তাকিয়ে অফিসার

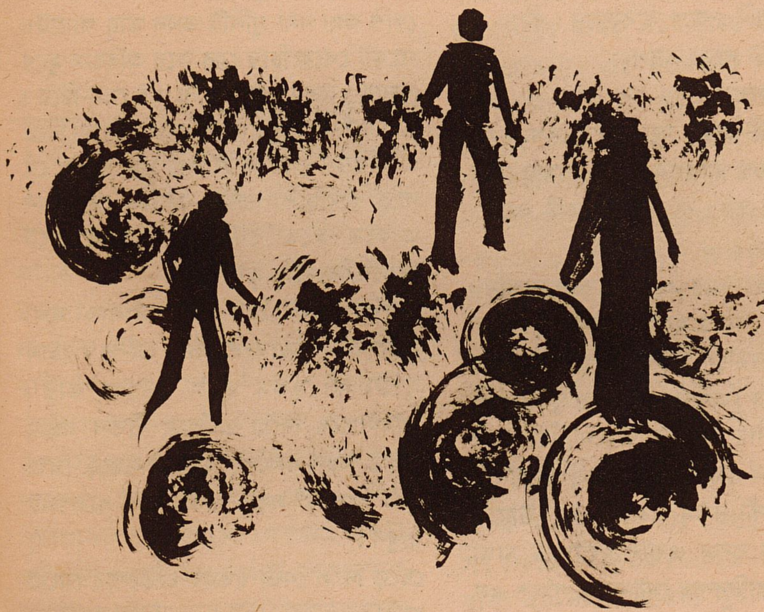

বললেন, পোটলাটা নাও। খুলে দেখো ভেতরে কী আছে।
সঙ্গে সঙ্গে রতনের বুক থেকে চিরের পোটলাটা ছিনিয়ে নিলো একজন। থানার মেঝেতে ফেলে পোটলাটা খুললো। চিরেগুলো ছড়িয়ে গেলো চারদিকে। চিরের তাজা, মিষ্টি একটা গন্ধে থানার গুমোট পরিবেশ কীরকম ম ম করে উঠলো।
অফিসারের কথা শুনে রতনের মনে হলো, প্রচন্ড খরায় চষা জমির মাটির ডেল যখন পাথরের মতো হয়ে ওছে, সেই ডেলা ভাঙবার জন্যে চাষি যে ইটামুগুর ব্যবহার করে সে রকম একটি ইটামুগুর দিয়ে হঠাৎ করেই কেউ তার বুকে প্রচন্ড জোরে আঘাত করেছে। ও রকম আঘাতে দম বন্ধ হয়ে

যায় মানুষের। চোখ ঠিকরে বেরোয়। মানুষ কোনো শব্দ করতে পারে না।

রতনও কোন শব্দ করতে পারলো না।

অফিসার বললেন, এই চিরে কেমিক্যাল টেস্টে পাঠাও আর বদমাসটাকে লকআপে ভরো।

বেশি কথা বলা পুলিশটি বললো, একটা কথা বলবো স্যার।

অফিসার রাগি চোখে তাকালেন। কী?

চিরের গন্ধটা বড়ো ভালো।

তাতে কী হয়েছে।

বলছিলাম কী একটু মুখে দিয়ে দেখবো?

অফিসার প্রচন্ড রাগলেন। যদি তোমার কোন একসিডেন্ট হয়। যা বললাম তাই করো। টেষ্টে পাঠাও।

রতন তারপর আর একটিও কথা বলেনি। একেবারেই পাথর হয়ে গিয়েছিলো। থানা হাজতের দেয়ালে হেলান দিয়ে সারারাত বসে থেকেছে। একজন টহলদার পুলিশ পাঁচ মিনিট পর পর গরাদের সামনে দিয়ে টহল গেছে। রতন তার দিকে ফিরেও তায়ানি।

ভোরবেলা কী রকম একটা গুঞ্জন উঠলো থানায়। কী রকম একটা ছুটোছুটি চাপা ফিসফাস। খানিকপর সেই দুজন পুলিশ এস লকআপ খুললো। রতন মাঝি, বেরাও।

কথাও বেশি বলা পুলিশটির প্যান্টের দুপকেট বেশ ফোলা।

রতন নিঃশব্দে লকআপ থেকে বুরুলো। পুলিশ দুজন ঠেলে তাকে এনে দাঁড় করালো সেই অফিসারের সামনে।

অফিসার কী রকম দুঃখি মুখ করে চেয়ারে বসে আছেন। চোখে উদাসীনতা কিংবা অন্য কিছু।

রতনকে দেখে চোখ তুলে তাকালেন তিনি। গভীর দুঃখের গলায় বললেন, নেতা কাল রাতে নিহত হয়েছেন। আমরা খবর পেয়েছি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ লোকজন, নেতার আদর্শে বিশ্বাসী, একই রাজনীতি দীর্ঘদিন করেছে তারা ষড়যন্ত্র করে নেতাকে হত্যা করেছে। তোমার ওপর আমি অবিচার করেছি ভাই। যাও বাড়ি যাও তুমি।

বেশি কথা বলা পুলিটি তখন তার প্যান্টের পকেট থেকে চিরে বের করে অবিরাম মুখে পুড়ছে। রতন বুঝে গেলো এই সেই চিরে। ভালোবেসে বহুদূর থেকে নেতার জন্যে নিয়ে এসেছিলো সে। কালিজিরা ধান কতো যে যত্নে বুনেছিলো বাড়ির নামায়। সেই ধান শুকিয়ে কতো যে যত্নে চিরাটা কুটে দিয়েছিলো তার কৃষাণী !

এসব ভেবে চোখ ভরে আসার কথা রতনের। কিন্তু হলো তার উল্টো। চোখ দুটো কী রকম জ্বলে উঠলো তার। অফিসারের দিকে তাকিয়ে শীতল গম্ভীর গলায় রতন বললো, আমাকে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না সাহেব। আমাকে হাজতেই রাখুন।

ছেড়ে দিলে নেতা হত্যার প্রতিশোধ নেবো আমি।

মোস্তফা সারয়া ফারুকী

ছবি ঃ দরকারী কিংবা দরবারী

বিতর্কটা বহু পুরোনো। শিল্পী ছবি আঁকবে কোনো ? ছবি আঁকার পেছনে তার মৌল প্রনোদনা কি? একরকম ভাবে ভাবলে, শিল্পী ছবি আঁকেন তার ষষ্ঠ সহযাত্রীর অলীক ইশারায়। এর পেছনে আর অন্য কোনো প্রনোদনা নেই। এখন সেই অলীক সহযাত্রী বাইরের দৃশ্যমান কিংবা ভেতরের অদৃশ্যমান ঘটনা বা ভাবনার প্র-ভাবে উত্তেজিত হয়ে থাকলে আমাদের কিছু বলার থাকেনা। কিন্তু ছবি তো কেবল এঁকে লুকিয়ে রাখবার বিষয় না। যখথনই একটা ছবি আঁকা হয়ে যায় তখনই সাথে সাথে প্রদর্শনের প্রশ্নটা এসে যায়। অর্থাৎ এখানে আরেকটা পক্ষের উপস্থিতি দরকারী হয়ে পড়ে। সেই পক্ষটির সক্রিয় এবং সভাব উপস্থিতিতেই ঘটে প্রাণের শিল্পযজ্ঞ। শিল্পীকে তাই ছবি আঁকতে হলে ঐ ঘর্ষাবিন্দুটার কথা স্মরনে রাখতে হয় যেখানটায় এসে শিল্পীর ভাবনাবিন্দুর সাথে দেখনেওয়ালার ভাবনাবিন্দুতে সংঘর্ষ ঘটে। এই সংঘর্ষটা সবসময় শিল্পীর কাংখিত বিন্দুতে কিংবা আকৃতিতেই ঘটতে হবে এমন নয়। কোনো একটা বিন্দুতে কিংবা, কোনো একটা আকৃতিতে ঘটলেই হলো।

প্রশ্ন হলো, শিল্পী কি সবসময়ই এই বিন্দুর পেছনেই ছুটবেন ? বোধ করি 'না'। এখানে তাহলে ঐ 'আসল' মানুষই উপেক্ষার আড়ালে পড়ে যান। কে তিনি ? ঐ 'ছয় নম্বর সাহাবী'। দেখা যায় কিংবা অনুভব করা যায় 'ইন্দ্রিয়' নামক এমন পাঁচজনার বাইরে তার চৌহদ্দী। এই পাঁচজনকে না চিনলে তাকে চেনা যায় না। পাঁচজনকে গুম করে ফেললে তিনি 'হাওয়া'। তার সংকেতের যাদুবলেই ছবির জন্ম। এখানে সবরূপ ছবির কথা বলছি- শব্দ-রং-রেখা-সুর-সবরূপ। সবছবির পেছনের এই আসল মানুষের চাহিদা মেটানো শিল্পীর মৌল দায় তাই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অনেকগুলো দরকারে কিংবা দরকারের কথা খেয়ালে রেখে শিল্পী ছবি আঁকেন। তাকে ছবি আঁকতে হয়ে এসবের মধ্যে থেকে।

বিতর্ক আছে, চিত্রকলার ক্ষেত্রে সব সময় সব ক্ষেত্রে এই দরকারগুলোর কথা খেয়াল রাখা হয় না। চিত্রকলা দুইদিক থেকে আক্রান্ত হচ্ছে।

এক. বিমূর্ততার নাম করে ছবিকে জনমানুষের কাছ থেকে দুরে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। অর্থাৎ চক্রান্তটার মধ্যে উত্তম-অধমের শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টের রাজনীতি আছে।

অভিযোগ নম্বর দুই. বাণিজ্যিক অনুষঙ্গের কারণে চিত্রকলা বড় লোকের 'দরবারী' শিল্পীকর্মে পরিনতি পেয়েছে। অভিযোগগুলো

নিয়ে নানা দেশে নানা কালে লেখালেখি হয়েছে প্রচুর। কথাকথি হয়েছে তার চেয়েও অধিক। যেহেতু ব্যাপারটার সাথে সৃজনশীলতার প্রসংগ জড়িত তাই থির কোনো মীমাংসা আসেনি। কেবল একটা

নানাভাবে অর্থযোগে আচমকা ফুলে-ফেঁপে ওঠা অসংখ্য 'হঠাৎ বিত্তশালী'র এই শহর ঢাকায় গ্যালারীর বাড়ন্ত সংখ্যা আর ছবির বিকিকিনি মূল্যের উর্ধ্বগতি দেখে কেউ কেউ বলে থাকতে পারেন 'আজকাল ঢাকায় চিত্রকলার কদর এবং চর্চা দুই-ই বেড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ঢাকাই হতে পারে এই অঞ্চলের চিত্রকলার রাজধানী।

কথাই বলা যায়, দরকারী হাতিয়ার থেকে ধীরে ধীরে 'দরবারী সৌন্দর্য-বর্ধক বস্তু'তে পরিণত হবার লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে।

নানাভাবে অর্থযোগে আচমকা ফুলে-ফেঁপে ওঠা অসংখ্য 'হঠাৎ বিত্তশালী'র এই শহর ঢাকায় গ্যালারীর বাড়ন্ত সংখ্যা আর ছবির বিকিকিনি মূল্যের উর্ধ্বগতি দেখে কেউ কেউ বলে থাকতে পারেন 'আজকাল ঢাকায় চিত্রকলার কদর এবং চর্চা দুই-ই বেড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ঢাকাই হতে পারে এই অঞ্চলের চিত্রকলার রাজধানী।' আপনার রূপে বিমোহিত এইসব অভিজাত শিল্পী এবং শিল্পবোদ্ধাদের আচরণ সন্দেজনক। এরা সর্ব অংগে খোস-পাঁচড়াভরা এক যুবতীর কপালে সিঁদুর পরিয়ে তার অংগসুচষমার স্তুতি করেন।

ঠিক এই ভাবনাসকলের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কিনা জানিনা পাঁচতরুন এক অপ্রথাগত প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। সম্প্রতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিক চত্বরে খোলা আকাশের নীচে এই প্রদর্শনী চলছে। প্রদর্শনীর আগে একটা সেমিনার হয়েছে। এবং প্রদর্শনী চলাকালীন একটা জরিপ কর্ম চালাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক আহাদুজ্জামান মহাশয় এবং তার কতক ছাত্র-ছাত্রী। গ্যালারী কেন্দ্রীক চিত্রকলা চর্চার বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ এই প্রদর্শনী না। শিল্পীদের কারো কারো সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও যোগাযোগের সুবাদে যতোটুকু বুঝেছি এটি একটা সম্ভাবনার অনুসন্ধান মাত্র। নগরীর অভিজাত এলাকা থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পকর্মকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে আসার একটা প্রচেষ্টা বলা যায় একে।

মোনাওয়ার মেহেদী, কাজী মনির, সন্ত বেলাল, অনিন্দ আর্য্য এবং মঞ্জুরুল ইসলাম এই পাঁচজনার আঁকা ছবির প্রদর্শনী। এদের ছবির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এই লেখার আরাধ্য নয়। উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু বলা এরা 'ছবি-দরবারী নাকি দরবারী'- এরকম যে একটা ভুলে যাওয়া দ্বন্দ্বের পূনঃসূচনা করে দিয়েছেন তা নিয়ে যদি শিল্পী এবং দর্শক দুইপক্ষই একটু ভাবেন- তাহলেই সিদ্ধি মিলবে এই উদ্যোগের। এটা নিয়ে ভাবলে চিত্রকলা তার কৌলিন্য হারাবে না বরং মানুষের যোগে আর প্রাণবান হয়ে উঠবে। বলবার কথা এইটুকুই।

BEXIMCO
একটি বেক্সিমকো মিডিয়া প্রকাশনা

বাংলার আশা
বাঙালির ভাষা

মুক্তকণ্ঠ
The Muktakantha
যেখানে আমার বাংলাদেশ, আমার নিজের মতো করে।
যোগাযোগ ঃ মুক্তকণ্ঠ ৩২, কাজি নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন ঃ ৯১২৭৭২৫-৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯১২৭৭২১, ই-মেইল mk@dhaka.agni.com
ইন্টারনেট : http://muktakantha.com.

With the best complements from

Al-Rafiu International
Al-Akeen Enterprise
Indentor, Importers & Exporters
Proprietor : Daulat Z. Ansary
78, Kazi Nazrul Islam Avenue (2nd floor)
Farmgate, Dhaka-1215, Bangladesh
Phone : 818251, 811631
Fax : 88-02-818251
Telex : 671248 HSL BJ

Wishing a grand success of

Monon

AL-DAS ENTERPRISE LTD.

21, Tejgaon Ind. Area
Dhaka-1208

WITH THE BEST COMPLEMENTS FROM

Eldlorado colours & Industries Ltd.

104, Motijheel C/A, Glod Chamber (2nd floor)
Dhaka, Phone : 9567664, Fax : 88-02-9567665

INDENTOR & IMPORTER

Suppeier of Textile, Knit, Dying and Washing Chemical

M/S HARUN CHEMICAL INDUSTRIES
87, S.C.C. Road Armanitola, Dhaka

M/S RASHID ENTERPRISE

2, Ashek Lane, Islampur
Dhaka.
Phone : 240721, 247000, 247117, Res. 246702

Proprietor : Md. Harun-Al-Rashid

শুচি সৈয়দ

মন, তুমি হীন এমন জীবন

১.
প্রত্যহের গল্পগুলি
লিখে রাখি জলে
জীবনের কান্না আমি
কেঁদেছি অনলে

২.
তোমার আকাশে আমি নেই
আমার আকাশে শুধু তুমি।

উ ৎ প ল দ ত্ত

একুশ উঠবে বেজে

রক্ত দিয়ে লেখা একুশ
সোনার বাংলার সবুজ তীরে।
স্তরে স্তরে উঠবে বেজে
নিত্য নতুন গানে সেজে।

নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের আসল কথা
জানাতে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাভিত্তিক গান
নিয়ে শিগগিরই বাজারে আসছে

মুক্তিযুদ্ধের গান

যারা লিখেছেন

১. শামসুর রাহমান
২. সুকুমার বড়ুয়া
৩. খালেক-বিন জয়েনউদ্দীন
৪. আমীরুল ইসলাম
৫. লুৎফর রহমান রিটন
৬. আসলাম সানী
৭. সারওয়ার-উল-ইসলাম

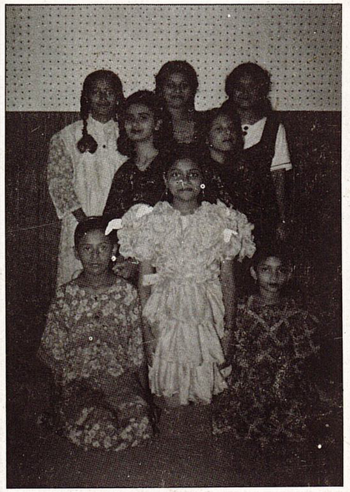

যারা গেয়েছেন

১. সাবিনা ইয়াসমিন
২. খালিদ হাসান মিলু
৩. ইফফাত আরা নার্গিস
৪. সাদি মোহম্মদ
৫. লিলি ইসলাম
৬. চয়ন ইসলাম
৭. অনিমা লিজা
সঙ্গে শিশু মঞ্চের শিশু শিল্পীরা।

সুর, সঙ্গীত ও পরিকল্পনা
চয়ন ইসলাম

প্রযোজনা : সংবর্ত

ফোন : ৮৮৬০৪৪

২০ টাকা